অধ্যায় ১১

জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন
GENETICS AND EVOLUTION

জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিতামাতা থেকে বংশাণুক্রমে সন্তানসন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বংশগতি বা হেরিডিটি (heredity) বলে। জিনগত সাদৃশ্যের কারণে একই প্রজাতির জীবের মধ্যে যেমন সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তেমনি এদের ভিন্নতার কারণে একই প্রজাতির জীবের মধ্যে ভিন্নতাও দেখা যায়। জীবের এ অমিল বা বৈসাদৃশ্যকে প্রকরণ (variation) বলে।

বংশগতি ও প্রকরণ জীবের নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব বিদ্যমান। বিজ্ঞানীদের ধারণা এক প্রজাতির জীব থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে অন্য প্রজাতির জীব। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য বেঁচে থাকার তাগিদেই এসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রজাতি গঠনে জীবজগতের যে কোনো ধারাবাহিক পরিবর্তন বিবর্তন বা অভিব্যক্তির (evolution) সূচনা ঘটায়। এ অধ্যায়ে জীবের জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দবলি (Key words)

❑ জিনতত্ত্ব ❑ অ্যালিল ❑ লিঙ্গ নির্ধারণ ❑ সেক্স লিঙ্কড ইনহেরিট্যান্স ❑ লিথাল জিন ❑ পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ❑ এপিস্ট্যাসিস ❑ মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স ❑ বর্ণান্ধতা ❑ হিমোফিলিয়া ❑ জৈব বিবর্তন ❑ ল্যামার্কিজম ❑ ডারউইনিজম

পিরিয়ড সংখ্যা ১৫। এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে -

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১। মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স সূত্রাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২। ইনহেরিট্যান্সের ক্রোমোসোম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩। মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪। পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫। লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬। সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭। রক্তের বংশগতি জনিত সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮। বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯। বিবর্তনের মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০। বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বর্ণনা করতে পারবে। ১১। প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।	● মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স ○ মেন্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র ● ইনহেরিট্যান্সের ক্রোমোসোম তত্ত্ব ● মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম ○ অসম্পূর্ণ প্রকটতা ○ সমপ্রকটতা ○ লিথাল জিন ○ পরিপূরক জিন ○ এপিস্ট্যাসিস ● পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ● লিঙ্গ নির্ধারণ (XX-XY,XX-XO) নীতি ● সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার ○ বর্ণান্ধতা ○ হিমোফিলিয়া ○ মাসকুলার ডিস্ট্রফি ● ABO রক্তগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা ○ রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা ○ গর্ভধারনজনিত সমস্যা (এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস) ● বিবর্তনের ধারণা ● বিবর্তনের মতবাদ ○ ল্যামার্কিজম ○ ডারউইনিজম ○ নিউ ডারউইনিজম ● বিবর্তনের প্রমাণাদি

১১.১ মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স (Mendelian Inheritance)

জিনতত্ত্ব (Genetics)

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের বংশগতি ও প্রকরণের রীতিনীতি অর্থাৎ বংশাণুক্রমিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি এবং এসব বৈশিষ্ট্যের বাহক জেনেটিক বস্তু তথা জিনের রাসায়নিক গঠন, প্রকরণ, মিউটেশন, পারস্পরিক ক্রিয়া, জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করা হয় তাকে জিনতত্ত্ব বা **Genetics** বা কৌলিতত্ত্ব বলে। গ্রিক শব্দ *genesis* হতে Genetics এর উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রকাশ পাওয়া (to become) বা উদ্ভূত হওয়া (to grow into)। উইলিয়াম বেটসন (Wiliam Bateson) 1906 সালে সর্বপ্রথম Genetics শব্দটি ব্যবহার করেন।

মেন্ডেলিজম (Mendelism)

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel, 1822-1884) জিনতত্ত্বের জনক হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন অস্ট্রিয়াবাসী একজন ধর্মযাজক ও শিক্ষক। তিনি দীর্ঘদিন মটরশুঁটি উদ্ভিদের সংকরায়ণ ও বংশগতি সম্পর্কিত গবেষণা ও নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন। এসব পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে তিনি জীবের বংশগতি সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সিদ্ধান্ত দুটিকে 'মেন্ডেলের সূত্র' নামে অভিহিত করা হয়। মেন্ডেলের সূত্র বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশগতিতে সঞ্চারণের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় তাকে 'মেন্ডেল তত্ত্ব বা মেন্ডেলিজম' (Mendelism) বলে।

1866 সালে মটরশুঁটি উদ্ভিদের সংকরায়ণ ও বংশগতি সম্মন্ধে মেন্ডেলের গবেষণার বিবরণ *'Experiments on plant hybridization'* শিরোনামে **Brunn Natural Science Society**-এর বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৎকালীন বিজ্ঞানীগণ ধর্মযাজক ও শিক্ষক মেন্ডেলের গবেষণার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। জীবদ্দশায় তাঁর গবেষণা কর্মের কোনোরূপ স্বীকৃতি না পেয়েই 1884 সালের 6 জানুয়ারি মেন্ডেল মৃত্যুবরণ করেন।

জোহান মেন্ডেল

দ্য ভ্রিস

কার্ল করেন্স

এরিখ চেরমার্ক

দীর্ঘ 34 বছর মেন্ডেলের গবেষণা কর্মের ফলাফল ধামাচাপা পড়ে থাকে। মেন্ডেলের মৃত্যুর 16 বছর পর অর্থাৎ 1900 সালে বিশ্বের তিনজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্বতন্ত্রভাবে মেন্ডেলের গবেষণার যথার্থতা পুনরাবিষ্কার করেন। এঁরা হলেন হল্যান্ডের উদ্ভিদবিজ্ঞানী হুগো দ্য ভ্রিস (Hugo de Vries), জার্মানির অধ্যাপক কার্ল এরিখ করেন্স (Carl Erich Correns) এবং অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী এরিখ ভন চেরমার্ক (Erich Von Tschermark)। এসব বিজ্ঞানীর পুনরাবিষ্কারের ফলে মেন্ডেলের গবেষণাকর্ম বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি লাভ করে এবং 1901 সালে তাঁর মূল গবেষণাপত্রটি **'Flora'** নামক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়। এসময় গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে জিনতত্ত্বের জনক (Father of Genetics) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। উইলিয়াম বেটসন মেন্ডেলের সকল পরীক্ষার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

মানব কল্যাণে জিনতত্ত্বের ভূমিকা (Roles of Genetics in Human Welfare)

জিনতত্ত্ব জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রায়োগিক শাখা। মানব কল্যাণে এর গুরুত্ব অনেক। যেমন-

১। জীবদেহে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি, প্রকরণ ও বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জিনতত্ত্বে জানা যায়।

২। জিনতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োগ করে সংকরায়ণ (hybridization) পদ্ধতিতে অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ ও উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু ও মাছ সৃষ্টি করা যায়।

CamScanner

৩। জিনতত্ত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল রোগ যেমন- বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, অ্যালবিনিজম ইত্যাদির প্রকৃত কারণ জানা ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

৪। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক্ষম ফসলের জাত সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে ।

৫। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, ভ্যাকসিন, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়।

৬। অপরাধী শনাক্তকরণ ও পিতৃমাতৃ সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য জিন প্রযুক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

৭। জিনতত্ত্বের জ্ঞানের আলোকে উচ্চশ্রেণির প্রাণীর ডিপ্লয়েড দেহকোষ থেকে ক্লোনিং পদ্ধতিতে প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

জিনতত্ত্বের কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা

১। জিন (Gene): জীবকোষে বিদ্যমান বংশগতিয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষুদ্রতম একককে জিন বলে। মেন্ডেল এদেরকে ফ্যাক্টর (factors) নামকরণ করেছিলেন।

২। অ্যালিল ও অ্যালিলোমর্ফ (Allele and allelomorph): জীবের কোনো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র বা লোকাসে অবস্থিত একজোড়া জিনের একটিকে অপরটির অ্যালিল বলে। জিনদ্বয়ের একত্রে থাকার অবস্থাকে অ্যালিলোমর্ফ বলে।

৩। হোমোজাইগাস (Homozygous): কোনো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী একই লোকাসে বিদ্যমান দুটি জিন যদি একই প্রকৃতির হয় তবে তাদের হোমোজাইগাস বলে। যেমন- TT অথবা tt।

৪। হেটারোজাইগাস (Heterozygus): কোনো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী একই লোকাসে বিদ্যমান দুটি জিন যদি ভিন্ন প্রকৃতির হয় তবে তাদের হেটারোজাইগাস বলে। যেমন- Tt ।

৫। জিনোটাইপ (Genotype): জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের প্রতীকী গঠনকে জিনোটাইপ বলে। যেমন- মটরশুঁটি উদ্ভিদের লম্বা বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ TT বা Tt।

৬। ফিনোটাইপ (Phenotype): জীবের প্রকাশিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফিনোটাইপ বলে। যেমন- লম্বা, খাটো, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি।

৭। প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant trait): কোনো হেটারোজাইগাস জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি জিনের মধ্যে যে জিনটির বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় তাকে প্রকট জিন এবং উক্ত জিনের বৈশিষ্ট্যকে প্রকট বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন, Tt জিনোটাইপ বিশিষ্ট হেটারোজাইগাস মটরশুঁটি উদ্ভিদের T জিন এবং এর দ্বারা প্রকাশিত 'লম্বা' বৈশিষ্ট্য প্রকট।

৮। প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive trait): কোনো হেটারোজাইগাস জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি জিনের মধ্যে যে জিনটির বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন জিন এবং উক্ত জিনের বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন, Tt জিনোটাইপ বিশিষ্ট হেটারোজাইগাস মটরশুঁটি উদ্ভিদের t জিন এবং এর দ্বারা অপ্রকাশিত 'খাটো' বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন।

৯। সংকর জীব (Hybrid): দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে প্রজননে সৃষ্ট সন্তানদের সংকর জীব বলে। সংকর জীব সর্বদা হেটারোজাইগাস প্রকৃতির হয়। বিশুদ্ধ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জীবদের সংকরায়ণে সৃষ্ট প্রথম সন্তানদের F_1 জনু বা প্রথম সংকর পুরুষ (First filial generation) বলে। F_1 জনুর সংকর জীবদের মধ্যে আন্তঃপ্রজননে সৃষ্ট জীবদের F_2 জনু বা দ্বিতীয় সংকর পুরুষ (Second filial generation) বলে।

১০। এক সংকর ক্রস (Monohybrid cross): জিনতত্ত্বের কোনো পরীক্ষায় যখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয় তখন তাকে এক সংকর ক্রস বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে। যেমন- বিশুদ্ধ লম্বা ও বিশুদ্ধ খাটো মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস।

CamScanner

১১। দ্বি সংকর ক্রস (Dihybrid cross): জিনতত্ত্বের কোনো পরীক্ষায় যখন দুইজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রেখে ক্রস বা সংকরায়ণ ঘটানো হয় তখন তাকে দ্বি-সংকর ক্রস বা ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। যেমন -হলুদ বর্ণ ও গোলাকৃতির বীজ বিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের সাথে সবুজ বর্ণ ও কুঞ্চিত বীজ বিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের ক্রস।

১২। টেস্ট ক্রস (Test cross): কোনো জীব হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য ঐ জীবের সাথে একই বৈশিষ্ট্যের জিন উপাদান বিশিষ্ট প্রচ্ছন্ন অ্যালিল বহনকারী আরেকটি জীবের ক্রসকে টেস্ট ক্রস বলে। যেমন -

$$AABB \times aabb = AaBb\ (F_1) \text{ অথবা } AaBb \times aabb$$

১৩। ব্যাক ক্রস (Back cross): F_1 জনুর জীব এবং তার মূল জনিতৃর (parents) মধ্যে অথবা জনিতৃর অনুরূপ জিনোটাইপ বহনকারী কোনো জীবের মধ্যে সংঘটিত ক্রসকে ব্যাক ক্রস বলে। যেমন-

$$AaBb \times AABB \text{ অথবা } AaBb \times aabb$$

১৪। জিনোম (Genome): কোনো প্রজাতির জীবের একসেট হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোসোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে। অথবা জীবের একটি জননকোষের ক্রোমোসোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে।

১৫। সেক্স ক্রোমোসোম (Sex chromosome): যেসব ক্রেমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে অর্থাৎ জীবের পুরুষ কিংবা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের সেক্স ক্রোমোসোম বা অ্যালোসোম বা ইডিওক্রোমোসোম বলে। যেমন- মানুষের 23 জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে মাত্র এক জোড়া সেক্স ক্রোমোসোম। এদের X ও Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষের কোনো জাইগোটে (ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্ট ভ্রূণকোষ) XY থাকলে পুত্র সন্তান এবং XX থাকলে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়।

১৬। অটোসোম (Autosome): যেসব ক্রোমোসোম জীবের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তাদের অটোসোম বলে। যেমন, মানুষের 23 জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে 22 জোড়াই অটোসোম। এদের A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মেন্ডেলের পরীক্ষা (Mendel's Experiments)

মেন্ডেল তাঁর গবেষণায় বিভিন্ন জাতের মটরশুঁটি উদ্ভিদ বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে পরাগায়ণ ঘটিয়ে কতগুলো সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের বংশগতি নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি দুটি পর্যায়ে পরীক্ষা চালান। দুধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল থেকে মেন্ডেল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা বর্তমানে মেন্ডেলের বংশগতির সূত্র (Mendel's Law of Heredity) নামে পরিচিত।

প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় মেন্ডেল পৃথক সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। এসব পরীক্ষায় একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস বা সংকরায়ণ ঘটিয়ে তার বংশগতি লক্ষ করেছিলেন বলে এদের মনোহাইব্রিড ক্রস বা এক-সঙ্কর ক্রস (Monohybrid Cross) বলা হয়। এ সংক্রান্ত ফলাফল বিশেষণে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তকে মেন্ডেলের বংশগতি সম্পর্কিত প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation) বলে।

মেন্ডেল তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করার জন্য দুইজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে বৈশিষ্ট্যের বংশগতি পর্যবেক্ষণ করেন বলে এদের ডাইহাইব্রিড ক্রস বা দ্বি-সঙ্কর ক্রস (dihybrid cross) বলে। কয়েকটি ডাইহাইব্রিড ক্রসের পরীক্ষা পর্যালেচনা করার পর মেন্ডেল তাঁর ফলাফল অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাকে মেন্ডেলের বংশগতি সম্পর্কিত দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র (Law of independent asssortment) নামে অভিহিত করা হয়।

মেন্ডেলের গবেষণায় সফলতার কারণ (Reasons for Mendel's success)

বিগত 2000 বছর যাবত উদ্ভিদ সংকরায়ণের কাজ চলে আসলেও মেন্ডেলের গবেষণার পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বংশগতি বিজ্ঞান কোনো শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মেন্ডেলের সফলতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন-

CamScanner

১। মেন্ডেল গবেষণা কাজে যেসব উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন তা ছিল বংশগতিয় গবেষণা কাজের জন্য অতি উত্তম ও আদর্শ।

২। মেন্ডেলের নির্বাচিত মটরশুঁটি উদ্ভিদ একটি স্বনিষিক্ত বর্ষজীবী এবং প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই এর ফুলে পরাগমুক্তি ঘটায় কোনোরূপ পরপরাগায়িত না হয়ে স্বনিষেক ঘটে।

৩। তিনি বেশ কয়েক বছর যাবত একাধারে তাঁর ফলাফল বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

৪। তিনি প্রথমে একজোড়া বৈসাদৃশ্য গুণ সম্পন্ন লক্ষণ নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে দুইজোড়া লক্ষণ নিয়ে কাজ করেছিলেন।

৫। ধারণা করা হয় মেন্ডেলের পূর্বসূরীরা একসাথে অনেকগুলো লক্ষণ নিয়ে গবেষণা করাতে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নাই।

৬। তিনি যে সাতজোড়া বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেছিলেন তার প্রত্যকটির জন্য দায়ী উপাদানটি অন্যটির উপর সম্পূর্ণরূপে প্রকট ছিল এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী উপাদানদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন হোমোলোগাস ক্রোমোসোমে অবস্থিত ছিল।

৭। মেন্ডেল তাঁর লব্দ ফলাফলকে দুটি অর্থপূর্ণ গাণিতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলেন। এর পূর্বে কোনো বিজ্ঞানীই সংকরায়ণের ফলাফলের গাণিতিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই।

মেন্ডেলের গবেষণায় মটরশুঁটি উদ্ভিদকে বেছে নেয়ার কারণ
(Why Mendel did selected garden sweet pea?)

নিম্নলিখিত কারণে মেন্ডেল তাঁর গবেষণার পরীক্ষায় মটরশুঁটি উদ্ভিদকে বেছে নিয়েছিলেন:

১। মটর গাছের একাধিক সুস্পষ্ট তুলনামূলক বিপরীত বংশগতিয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং এতে বহুপ্রকরণ বিদ্যমান।

২। মটরশুঁটি উদ্ভিদ একবর্ষজীবী গুল্ম জাতীয় ছোট উদ্ভিদ হওয়ায় এটি সহজে বাগানে ও টবে চাষ করা যায়।

৩। এর আয়ুষ্কাল স্বল্প হওয়ায় খুব দ্রুত সংকরায়ণের ফল লাভ করা যায়।

৪। এর ফুল উভলিঙ্গ হওয়ায় কোনোরূপ পরপরাগায়িত না হয়ে স্বনিষেক ঘটে। ফলে বংশ পরম্পরায় বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

৫। এদের ফুলগুলো আকারে বড় হওয়ায় অতি সহজেই কৃত্রিম সংকরায়ণ ঘটানো সম্ভব হয়।

৬। সংকরায়ণে সৃষ্ট মটরশুঁটির উদ্ভিদের বংশধরগুলো উর্বর প্রকৃতির হওয়ায় এরা নিয়মিত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম।

মেন্ডেলের পরীক্ষায় ব্যবহৃত মটরশুটি উদ্ভিদের 7 জোড়া বৈশিষ্ট্য

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	বীজের আকার	বীজের বর্ণ	পুষ্পের বর্ণ	ফলের আকার	ফলের বর্ণ	পুষ্পের অবস্থান	কাণ্ডের দৈর্ঘ্য
প্রকট বৈশিষ্ট্য							
	গোলাকার	হলুদ	রঙ্গিন	মসৃণ	সবুজ	কাক্ষিক	লম্বা
প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য							
	কুঞ্চিত	সবুজ	সাদা	খাঁজযুক্ত	হলুদ	শীর্ষক	খাটো

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র (Mendel's First Law)

মেন্ডেলের প্রথম সূত্রকে পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation) বা মনোহাইব্রিড ক্রস সূত্র (Law of Monohybrid Cross) বা জননকোষ বিশুদ্ধতার সূত্র (Law of Purity of Gametes) বলা হয়।

সূত্রের বর্ণনা

একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রসে (প্রজননে) সৃষ্ট সংকরজীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামিট (জননকোষ) সৃষ্টির সময় এগুলো পরস্পর হতে পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামিটে (জননকোষে) গমন করে।

সূত্রের উদাহরণ

মেন্ডেল তাঁর সকল পরীক্ষাই মটরশুঁটি উদ্ভিদের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিলেন। অন্যান্য অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা এ সূত্রের পরীক্ষা করা যায়। এ পুস্তকে মটরশুঁটি উদ্ভিদের মাধ্যমে সূত্রের উদাহরণ উল্লেখ করা হলো। মটরশুঁটি উদ্ভিদের দীর্ঘ কাণ্ড বৈশিষ্ট্য খাটো কাণ্ডের বৈশিষ্ট্যের উপর প্রকট। একটি বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের সাথে একটি বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের ক্রস বা প্রজনন ঘটানো হলে প্রথম সংকর পুরুষে বা F_1 জনুতে সৃষ্ট সকল মটরশুঁটি উদ্ভিদ দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট হয়। পুনরায় F_1 জনুর সংকর (হেটারোজাইগাস) দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে স্বনিষেক ঘটালে দ্বিতীয় সংকর পুরুষ বা F_2 জনুতে সৃষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের 75% দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট এবং 25% খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ দীর্ঘ ও খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের অনুপাত হয় 3 ঃ 1.

সূত্রের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

মেন্ডেলের বর্ণনা অনুযায়ী যে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য একজোড়া ফ্যাক্টর (জিন) দায়ী থাকে। যদি দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের জিনকে T এবং খাটো কাণ্ড বিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের জিনকে t ধরা হয় তাহলে মটরশুঁটি উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জিনোটাইপ হবে-

(১) বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদ = TT

(২) বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদ = tt

(৩) সংকর (হেটারোজাইগাস) দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদ =Tt

TT
দীর্ঘ কাণ্ড

tt
খাটো কাণ্ড

দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের সাথে এবং খাটো কাণ্ড বিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের ক্রস বা প্রজনন ঘটানো হলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

বিশুদ্ধ মাতৃ জনু (P_1) ⟶ ♀ TT × ♂ tt

গ্যামিট ⟶ T, t

নিষেক

F_1 জনু ⟶ Tt (সংকর দীর্ঘ কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদ)

সংকর মাতৃ জনু (P_2) ⟶ ♀ Tt × ♂ Tt

নিষেক

F_2 জনু ⟶

গ্যামিট	T	t
T	TT (দীর্ঘ কাণ্ড)	Tt (দীর্ঘ কাণ্ড)
t	Tt (দীর্ঘ কাণ্ড)	Tt (খাটো কাণ্ড)

CamScanner

F_2 জনুতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় সৃষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে 75% দীর্ঘ কাণ্ড বিশিষ্ট এবং 25% খাটো উদ্ভিদ অর্থাৎ দীর্ঘ ও খাটো কাণ্ডবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের ফিনোটাইপিক অনুপাত 3 ঃ 1.

F_2 জনুতে সৃষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের জিনোটাইপিক অনুপাত - TT ঃ Tt ঃ tt = 1 ঃ 2 ঃ 1.

উপরোক্ত সকল ফলাফলে দেখা যায় যে, সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্য দুটি মিশ্রিত না হয়ে কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায় এবং গ্যামিট সৃষ্টির সময় প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন পৃথক পৃথক গ্যামিটে গমন করে। যেহেতু প্রতিটি গ্যামিট কেবল কোনো বৈশিষ্ট্যের একটি অ্যালিল (ফ্যাক্টর) গ্রহণ করে সেহেতু এটি বিশুদ্ধ প্রকৃতির হয়। এজন্য একে বিশুদ্ধ গ্যামিট এবং সুত্রটিকে **জননকোষ বিশুদ্ধতার সূত্র** বলে।

মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের প্রাণীর উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা

সূত্রের উদাহরণ

মেন্ডেল তাঁর সকল পরীক্ষাই মটরশুঁটি উদ্ভিদের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিলেন। অন্যান্য অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী দ্বারা এ সূত্রের পরীক্ষা করা যায়। নিম্নে গিনিপিগের মাধ্যমে সূত্রের উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

গিনিপিগের দেহলোমের কালো বর্ণ বাদামী বর্ণের উপর প্রকট। একটি বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) কালো বর্ণের গিনিপিগের সাথে একটি বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) বাদামী বর্ণের গিনিপিগের ক্রস বা প্রজনন ঘটানো হলে প্রথম সংকর পুরুষে বা F_1 জনুতে সৃষ্ট সকল গিনিপিগের গাত্রবর্ণ কালো হয়। পুনরায় F_1 জনুর সংকর (হেটারোজাইগাস) কালো বর্ণের গিনিপিগদের মধ্যে আন্তঃপ্রজনন ঘটালে দ্বিতীয় সংকর পুরুষ বা F_2 জনুতে সৃষ্ট গিনিপিগদের 75% কালো বর্ণের এবং 25% বাদামী বর্ণের হয় অর্থাৎ কালো ও বাদামী গাত্রবর্ণের গিনিপিগের অনুপাত হয় 3 ঃ 1 ।

সূত্রের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

মেন্ডেলের বর্ণনা অনুযায়ী যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য একজোড়া ফ্যাক্টর (জিন) দায়ী থাকে। যদি দেহলোমের কালো বর্ণের প্রকট বৈশিষ্ট্যের জিনকে B এবং বাদামী বর্ণের প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের জিনকে b ধরা হয় তাহলে গিনিপিগের বিভিন্ন বর্ণের প্রাণীদের জিনোটাইপ হবে-

(১) বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) কালো বর্ণের গিনিপিগ = BB

(২) বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) বাদামী বর্ণের গিনিপিগ = bb

(৩) সংকর (হেটারোজাইগাস) কালো বর্ণের গিনিপিগ = Bb

F_1 জনুর ফলাফল

পিতামাতার ফিনোটাইপ → কালো ♂ × বাদামী ♀

পিতামাতার জিনোটাইপ → BB bb

গ্যামিট (জননকোষ) → B B b b

নিষেক →

F_1 জনুর জিনোটাইপ → Bb Bb Bb Bb

F_1 জনুর ফিনোটাইপ → সকলেই কালো বর্ণের

(♀= স্ত্রী প্রাণীর প্রতীক; ♂= পুরুষ প্রাণীর প্রতীক)

কালো বর্ণের জিন B বাদামী বর্ণের জিন b এর উপর প্রকট হওয়ায় F_1 জনুতে সৃষ্ট সকল গিনিপিগের গাত্রবর্ণই কালো হয়।

CamScanner

F_2 জনুর ফলাফল

পিতামাতার ফিনোটাইপ ⟶ কালো (সংকর) ♂ × কালো (সংকর) ♀

পিতামাতার জিনোটাইপ ⟶ Bb Bb

গ্যামিট ⟶ B b B b

গ্যামিট ♀ / গ্যামিট ♂	B	b
B	BB কালো	Bb কালো
b	Bb কালো	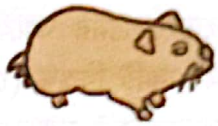 bb বাদামী

নিষেক

F_2 জনুতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় সৃষ্ট গিনিপিগের মধ্যে 75% কালো এবং 25% বাদামী বর্ণের অর্থাৎ কালো ও বাদামী বর্ণের গিনিপিগদের অনুপাত 3 ঃ 1 ।

F_2 জনুতে সৃষ্ট গিনিপিগের জিনোটাইপিক অনুপাত - BB ঃ Bb ঃ bb = 1 ঃ 2 ঃ 1

উপরোক্ত সকল ফলাফলে দেখা যায় যে সংকর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্য দুটি মিশ্রিত না হয়ে কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায় এবং গ্যামিট সৃষ্টির সময় প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন পৃথক পৃথক গ্যামিটে গমন করে।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র (Mendel's Second Law)

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রকে স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্র (Law of Independent Assortment) বলা হয়।

সূত্রের বর্ণনা

ডাইহাইব্রিড বা পলিহাইব্রিড ক্রসে কোনো জীবের দুই বার ততোধিক জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) গ্যামিট (জননকোষ) সৃষ্টির সময় স্বাধীন ও মুক্তভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামিটে সঞ্চারিত হয় এবং এসঞ্চারণে একজোড়া ফ্যাক্টর অন্য জোড়ার উপর নির্ভরশীল নয়।

সূত্রের উদাহরণ

মেন্ডেল দুইজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মটরশুঁটির উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে তাঁর দ্বিতীয় সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ ধরনের ক্রসকে ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। এখানে মটরশুঁটি উদ্ভিদের ডাইহাইব্রিড ক্রস দ্বারা মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্রটির উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

মটরশুঁটি উদ্ভিদ বীজের গোলাকার-হলুদ বৈশিষ্ট্য সবুজ-কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রকট। বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) গোলাকার-হলুদ বীজধারী মটরশুঁটি উদ্ভিদের সাথে বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) কুঞ্চিত-সবুজ বীজধারী মটরশুঁটি উদ্ভিদের সংকরায়ণ ঘটানো হলে F_1 জনুতে উৎপন্ন সকল মটরশুঁটি উদ্ভিদের বীজই গোলাকার-হলুদ হয়। F_1 জনুর সংকর

CamScanner

গোলাকার-হলুদ বীজধারী মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে স্বপরাগায়ণ ঘটানো হলে F_2 জনুতে নিম্নলিখিত অনুপাতে চার ধরনের বীজ পাওয়া যায়-

গোলাকার-হলুদ ঃ গোলাকার-সবুজ ঃ কুঞ্চিত-হলুদ ঃ কুঞ্চিত-সবুজ = 9 ঃ 3 ঃ 3 ঃ 1

সূত্রের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

মটরশুঁটি উদ্ভিদ বীজের গোলাকার বৈশিষ্ট্যের জিনকে R, হলুদ বর্ণের জিনকে Y, কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের জিনকে r এবং সবুজ বর্ণের জিনকে y প্রতীকে চিহ্নিত করলে বিশুদ্ধ বীজবিশিষ্ট মটরশুঁটি উদ্ভিদের জিনোটাইপ হয়-

বিশুদ্ধ গোলাকার-হলুদ বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ = RRYY

বিশুদ্ধ কুঞ্চিত-সবুজ বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ = rryy

F_1 জনুর ফলাফল

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ ⟶ গোলাকার-হলুদ বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ ♀ × কুঞ্চিত-সবুজ বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ ♂

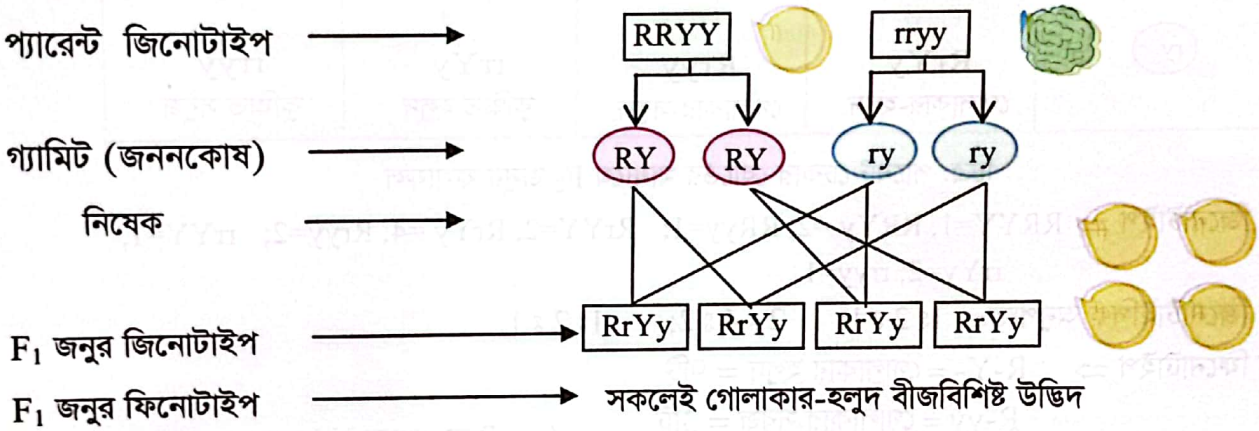

গোলাকার বৈশিষ্ট্যের R জিন কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যের r জিনের উপর প্রকট এবং হলুদ বর্ণের Y জিন সবুজ বর্ণের y জিনের উপর প্রকট হওয়ায় F_1 জনুতে উৎপন্ন মটরশুটি উদ্ভিদের সকল বীজই গোলাকার-হলুদ প্রকৃতির হয়।

F_2 জনুর ফলাফল (স্বপরাগায়ণ)

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ ⟶ গোলাকার-হলুদ বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ (সংকর) ♀ × গোলাকার-হলুদ বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ (সংকর) ♂

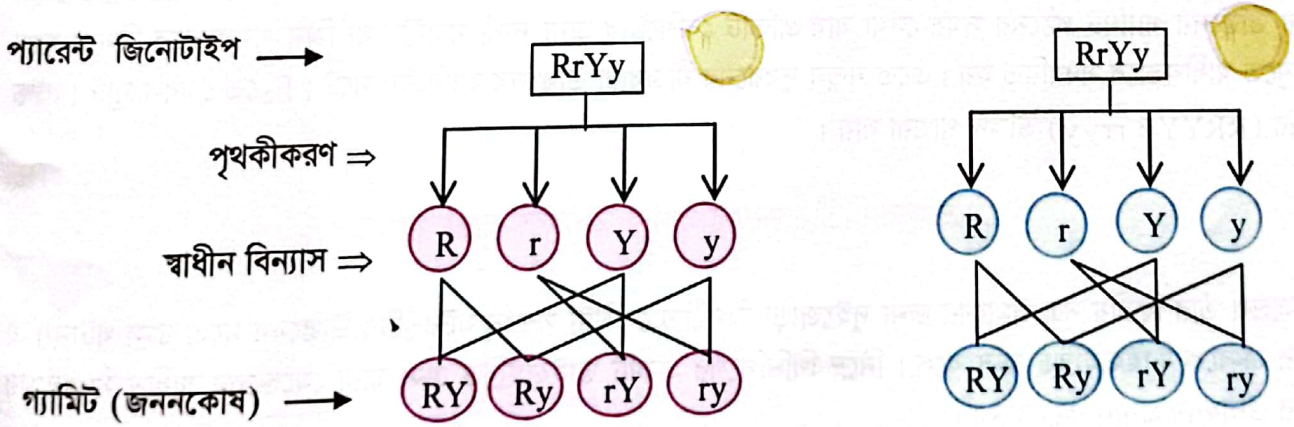

F_1 জনুর সংকর জাতের উদ্ভিদ থেকে চার ধরনের গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি করে। F_2 জনুতে এরা 16 ধরনের জাইগোট গঠনের মাধ্যমে চার ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করে যা নিম্নের পানেট চেকার বোর্ডে দেখানো হলো-

♀ গ্যামিট / ♂ গ্যামিট	RY	Ry	rY	ry
RY	RRYY গোলাকার-হলুদ	RRYy গোলাকার-হলুদ	RrYY গোলাকার-হলুদ	RrYy গোলাকার-হলুদ
Ry	RRYy গোলাকার-হলুদ	RRyy গোলাকার-সবুজ	RrYy গোলাকার-হলুদ	Rryy গোলাকার-সবুজ
rY	RrYY গোলাকার-হলুদ	RrYy গোলাকার-হলুদ	rrYY কুঞ্চিত হলুদ	rrYy কুঞ্চিত হলুদ
ry	RrYy গোলাকার-হলুদ	Rryy গোলাকার-সবুজ	rrYy কুঞ্চিত হলুদ	rryy কুঞ্চিত সবুজ

চিত্র: পানেট চেকার বোর্ডের মাধ্যমে F_2 জনুর ফলাফল

F_2 জনুর জিনোটাইপ ⇒ RRYY=1, RRYy =2, RRyy=1; RrYY=2, RrYy =4, Rryy=2; rrYY=1, rrYy=2, rryy=1.

F_2 জনুর জিনোটাইপিক অনুপাত⇒ 1ঃ 2 ঃ 1; 2 ঃ 4 ঃ 2; 1ঃ 2 ঃ 1.

F_2 জনুর ফিনোটাইপ ⇒ R-Y- = গোলাকার হলুদ = 9টি
R-yy = গোলাকার সবুজ = 3টি
rrY- = কুঞ্চিত হলুদ = 3টি
rryy = কুঞ্চিত সবুজ = 1টি
(- = R বা r অথবা Y অথবা y)

F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত ⇒ গোলাকার-হলুদ ঃ গোলাকার-সবুজ ঃ কুঞ্চিত হলুদ ঃ কুঞ্চিত সবুজ
9 ঃ 3 ঃ 3 ঃ 1

উপরোক্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণে দেখা যায় F_1 জনুতে সৃষ্ট উদ্ভিদে কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। F_1 জনুর সংকর উদ্ভিদের গ্যামিট গঠনের সময় দেখা যায় প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টর বা জিন পৃথকভাবে বিন্যস্ত হয়ে F_2 জনুতে স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়। এতে নতুন দুধরনের বীজধারী উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে। F_2 তে কেবল দুটি বিশুদ্ধ ধরনের (RRYYও rryy) উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের প্রাণীর উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা

সূত্রের উদাহরণ

মেন্ডেল তাঁর দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণের জন্য দুইজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মটরশুঁটির উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস ঘটান। এ ধরনের ক্রসকে ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। নিম্নে গিনিপিগের একটি ডাইহাইব্রিড ক্রস দ্বারা মেন্ডেলের স্বাধীন সঞ্চারণের সূত্রটির উদাহরণ প্রদান করা হলো।

গিনিপিগের কালো বর্ণ ও ছোট লোম যথাক্রমে বাদামী বর্ণ ও লম্বা লোমের উপর প্রকট। বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) কালো-ছোট লোমধারী (black-short hair) গিনিপিগের সাথে বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) বাদামী-লম্বা লোমধারী

CamScanner

(brown-tall hair) গিনিপিগের সংকরায়ণ ঘটানো হলে F_1 জনুতে উৎপন্ন সকল গিনিপিগই কালো-ছোট লোমধারী হয়। F_1 জনুর সংকর কালো-ছোট লোমধারী পুরুষ ও স্ত্রী গিনিপিগের মধ্যে আন্তঃপ্রজনন ঘটানো হলে F_2 জনুতে নিম্নলিখিত অনুপাতে গিনিপিগ জন্মলাভ করে-

কালো-ছোট লোম ঃ কালো-লম্বা লোম ঃ বাদামী-ছোট লোম ঃ বাদামী-লম্বা লোম = 9 : 3 : 3 : 1

সূত্রের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

গিনিপিগের কালো বর্ণের জিনকে B, ছোট লোমের জিনকে S, বাদামী বর্ণের জিনকে b এবং লম্বা লোমের জিনকে s প্রতীকে চিহ্নিত করলে বিশুদ্ধ গিনিপিগদের জিনোটাইপ হয়-

বিশুদ্ধ কালো বর্ণ-ছোট লোমধারী গিনিপিগ = BBSS

বিশুদ্ধ বাদামী বর্ণ-লম্বা লোমধারী গিনিপিগ = bbss

F_1 জনুর ফলাফল

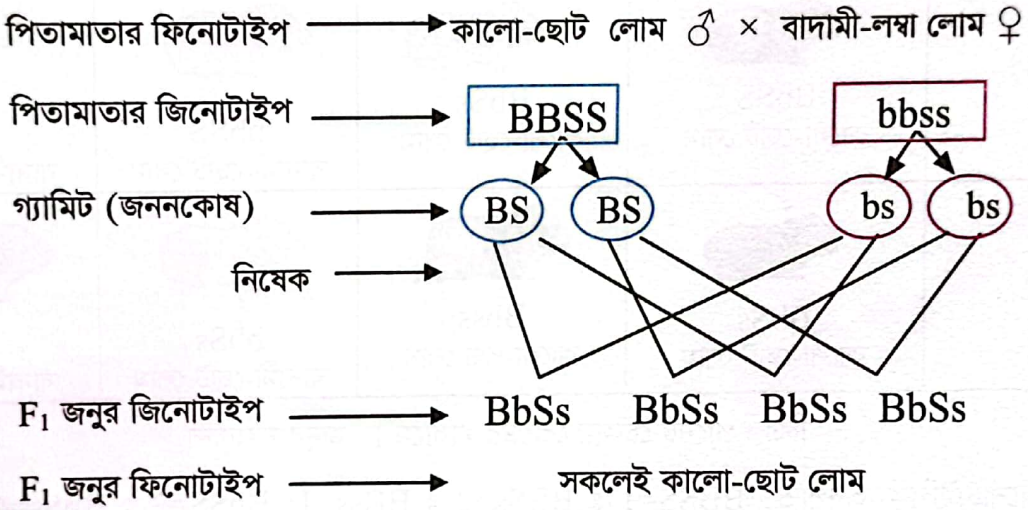

কালো বর্ণের B জিন বাদামী বর্ণের b জিনের উপর প্রকট এবং ছোট লোমের S জিন লম্বা লোমের s জিনের উপর প্রকট হওয়ায় F_1 জনুতে উৎপন্ন সকল গিনিপিগই কালো বর্ণ ও ছোট লোমধারী হয়।

F_2 জনুর ফলাফল

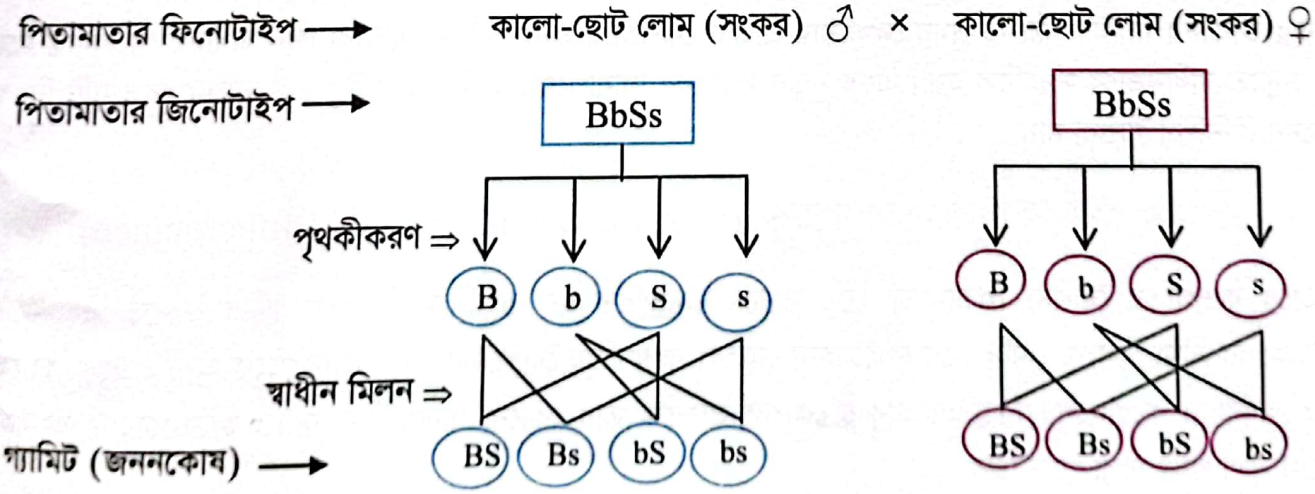

F_1 জনুর সংকর জাতের গিনিপিগ চার ধরনের গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি করে। F_2 জনুতে এরা 16 ধরনের জাইগোট গঠনের মাধ্যমে অপত্য প্রাণী সৃষ্টি করে যা নিম্নের পানেট চেকার বোর্ডে দেখানো হলো-

CamScanner

গ্যামিট ♀ / গ্যামিট ♂	BS	Bs	bS	bs
BS	BBSS কালো-ছোট লোম	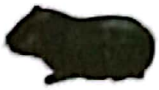 BBSs কালো-ছোট লোম	BbSS কালো-ছোট লোম	BbSs কালো-ছোট লোম
Bs	BBSs কালো-ছোট লোম	BBss কালো-লম্বা লোম	BbSs কালো-ছোট লোম	Bbss কালো-লম্বা লোম
bS	BbSS কালো-ছোট লোম	BbSs কালো-ছোট লোম	bbSS বাদামী-ছোট লোম	bbSs বাদামী-ছোট লোম
bs	BbSs কালো-ছোট লোম	Bbss কালো-লম্বা লোম	bbSs বাদামী-ছোট লোম	bbss বাদামী-লম্বা লোম

চিত্র : পানেট চেকার বোর্ডের মাধ্যমে F_2 জনুর ফলাফল

F_2 জনুর জিনোটাইপিক অনুপাত, BBSS=1 ঃ BBSs=2 ঃ BBss=1; BbSS=2 ঃ BbSs=4 ঃ Bbss=2; bbSS=1 ঃ bbSs=2 ঃ bbss=1.

F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত = কালো-ছোট লোম ঃ কালো-লম্বা লোম ঃ বাদামী-ছোট লোম ঃ বাদামী-লম্বা লোম

9 ঃ 3 ঃ 3 ঃ 1

উপরোক্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণে দেখা যায় F_2 জনুতে সৃষ্ট প্রাণীতে কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। F_1 জনুর সংকর জীবদের গ্যামিট গঠনের সময় দেখা যায় প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টর বা জিন স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে F_2 জনুতে স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়। এতে নতুন দুধরনের গিনিপিগের আবির্ভাব ঘটে। F_2 জনুতে কেবল দুটি বিশুদ্ধ ধরনের গিনিপিগ পাওয়া যায়।

১১.২ বংশগতির ক্রোমোসোম তত্ত্ব (Chromosomal Theory of Inheretance)

কীভাবে বংশগতিয় বৈশিষ্ট্য পিতামাতা হতে সন্তানে স্থানান্তরিত হয় তা নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। যদিও গ্রেগর জোহান মেন্ডেল বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহের নীতি আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু এর প্রকৃত কৌশল সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। এছাড়া তাঁর এ আবিষ্কার 1900 সাল পর্যন্ত চাপা পড়ে ছিল।

1900 সালে ক্রোমোসোমের গঠন আবিষ্কার হওয়ার পর জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ফ্যাক্টরসমূহ (জিনসমূহ) ক্রোমোসোমে থাকে-এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। 1902 সালে আমেরিকান জিনতত্ত্ববিদ ওয়াল্টার সাটন (Walter

Sutton) এবং জার্মান জিনতত্ত্ববিদ থিওডর বোভেরি (Theodor Boveri) তাঁদের ক্রোমোসোম মাইগ্রেশন উপাত্তের সাথে মেন্ডেলের উপাত্তের তুলনা করে মতবাদ ব্যক্ত করেন যে মেন্ডেলের বর্ণনাকৃত ফ্যাক্টর বা জিনগুলো কোষের ক্রোমোসোমে অবস্থান করে। তাঁদের মতে যেহেতু মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোসোম এককভাবে বিচরণ করে সেহেতু একটি ক্রোমোসোমের সব জিন পরস্পর সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। সাটন ও বোভেরির এ মতবাদটি বংশগতির ক্রোমোসোম তত্ত্ব বা **Chromosome theory of inheritance** নামে পরিচিত।

বংশগতির ক্রোমোসোম তত্ত্ব অনুযায়ী-

১। ক্রোমোসোম এবং জিনোমসমূহ ডিপ্লয়েড কোষে জোড় অবস্থায় থাকে।

২। মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোসোম পরস্পর হতে পৃথক হয়ে যায়।

৩। জীবের গ্যামিট কোনো বৈশিষ্ট্যের কেবল একটি অ্যালিল ধারণ করে।

৪। নিষেকের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। কোষে কেবল হোমোলোগাস ক্রোমোসোমগুলো স্বাধীনভাবে পৃথক হয় এবং মিলিত হয়।

৬। অনেক জীবে ক্রোমোসোম দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, একে সেক্স ক্রোমোসোম বা অ্যালোসোম বলে।

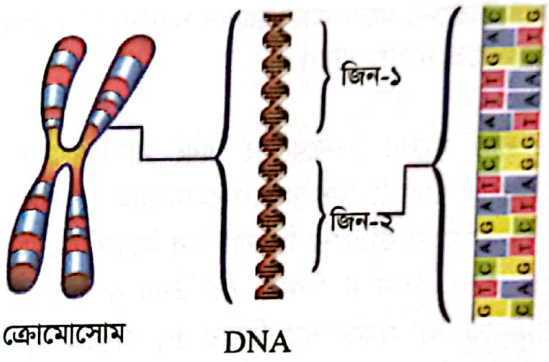

মেন্ডেলের ফ্যাক্টর বা জিনগুলো ক্রোমেসোমে থেকে জীবের বংশগতিয় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য ক্রোমোসোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি (physical basis of heredity) বলা হয়। মেন্ডেলের নীতি মেনে চলে না এমন কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বংশগতির ক্রোমোসোম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। এদের মধ্যে জিন লিংকেজ, ক্রসিং ওভার ও সেক্স লিংকেজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১.৩ মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম (Deviations of Mendel's Laws)

মেন্ডেলের জিনতাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সূত্র হতে জীবের বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া যায় সেগুলো হলো-

১। একজোড়া জিন এক লোকাসে থেকে কেবল একটি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২। প্রকট জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায় তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

৩। প্রচ্ছন্ন জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে সক্ষম।

৪। সংকরজীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জিনগুলো সম্মিলিতভাবে মাঝামাঝি কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না করে পাশাপাশি অবস্থান করে।

৫। ক্রোমোসোমের এক লোকাসের জিন অন্য লোকাসের জিনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।

৬। গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টির সময় প্রতিটি জিন স্বাধীনভাবে সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু বাস্তবে অনেক বংশগতিয় পরীক্ষায় দেখা গেছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন এসব মেন্ডেলিয় নিয়ম মেনে চলে না। ফলে সব ধরনের জিনতাত্ত্বিক পরীক্ষা থেকে মেন্ডেলিয়ান 3 ঃ 1 কিংবা 9 ঃ 3 ঃ 3 ঃ 1 অনুপাত সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। এ ধরনের ব্যতিক্রমি বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে নন-মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স (Non-mendelian inheritance) বা ব্লেন্ডিং ইনহেরিটেন্স (blending inheritance) বলে। এসব ক্ষেত্রে মেন্ডেলের সূত্রের অনুপাত পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ পায়। নিম্নে এধরনের কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করা হলো-

CamScanner

১। অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete dominance)- ফলাফল 1 : 2 : 1

কোনো মনোহাইব্রিড ক্রসে যখন পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন দুটির কোনটিই সম্পূর্ণভাবে প্রকট না হয়ে সংকর জীবে হেটারোজাইগাস অবস্থায় উভয় বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায় তখন জিনের এ ধরনের স্বভাবকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনকে ইন্টারমিডিয়েট জিন (intermediate gene) বলে। কার্ল করেন্স (Carl Correns) 1903 সালে এটি আবিষ্কার করেন।

উদাহরণ

লাল ও সাদা ফুলবিশিষ্ট সন্ধ্যামালতি (four O' clock plant, *Mirabilis jalapa*) উদ্ভিদের মধ্যে পরাগায়ন ঘটানো হলে দেখা যায় F_1 জননের সকল উদ্ভিদের ফুলই গোলাপি (pink) রঙের হয়। F_1এ সৃষ্ট গোলাপি রঙের ফুল বিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে আন্তঃপ্রজনন ঘটানো হলে দেখা যায় F_2 জনুর উদ্ভিদে লাল, গোলাপী ও সাদা রঙের ফুল 1 : 2 : 1 অনুপাতে প্রকাশ পায়।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

লাল ফুলের জিনকে R এবং সাদা ফুলের জিনকে r দ্বারা চিহ্নিত করলে হোমাজাইগাস লাল ও সাদা ফুলের উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে যথাক্রমে RR ও rr। জিন R জিন r এর উপর সম্পূর্ণরূপে ডমিন্যান্ট বা প্রকট নয় বিধায় F_1 জনুতে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদের ফুলগুলো গোলাপি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে R জিনের অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণেই গোলাপি ফুলের সৃষ্টি হয়। F_1 জনুর আন্তঃপ্রজননে সৃষ্ট ফুল গাছে F_2 জনুতে তিন ধরনের ফুল পাওয়া যায়। ফলাফল নিচের ছকে দেয়া হলো-

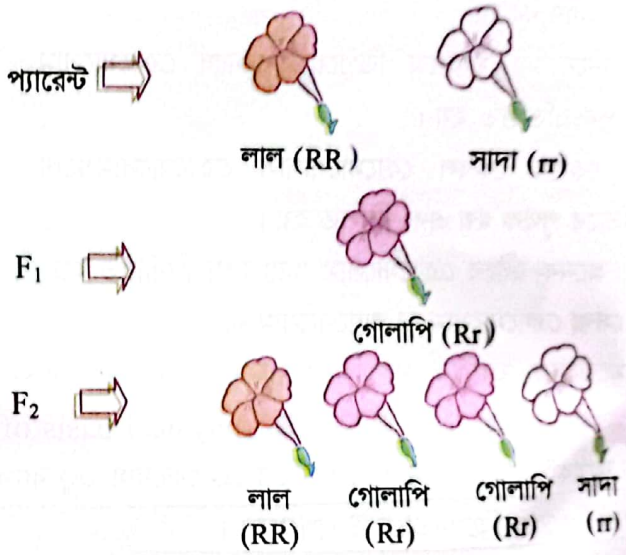

F_1 জনুর ফলাফল

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ ⟶ লাল ফুল বিশিষ্ট উদ্ভিদ ♀ × সাদা ফুল বিশিষ্ট উদ্ভিদ ♂

প্যারেন্ট জিনোটাইপ ⟶ RR × rr

গ্যামিট (জননকোষ) ⟶ R, R × r, r

নিষেক ⟶

F_1 জনুর জিনোটাইপ ⟶ Rr, Rr, Rr, Rr

F_1 জনুর ফিনোটাইপ ⟶ সকলেই গোলাপি ফুল বিশিষ্ট উদ্ভিদ

F_2 জনুর ফলাফল

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ ⟶ গোলাপি ফুল বিশিষ্ট উদ্ভিদ (সংকর) ♀ × গোলাপি ফুল বিশিষ্ট উদ্ভিদ (সংকর)

প্যারেন্ট জিনোটাইপ ⟶ Rr × Rr

গ্যামিট (জননকোষ) ⟶ R, r × R, r

F_2 জনুর নিষেকের ফলাফল পানেট চেকারবোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো

♀ গ্যামিট / ♂ গ্যামিট	R	r
R	RR লাল ফুল	Rr গোলাপি ফুল
r	Rr গোলাপি ফুল	rr সাদা ফুল

নিষেক

F_2 জনুর ফিনোটাইপিক অনুপাত- লাল ঃ গোলাপি ঃ সাদা = 1 ঃ 2 ঃ 1

২। সমপ্রকটতা (Codominance)-ফলাফল 1 ঃ 2 ঃ 1

সংকরজীবে যখন দুটি বিপরীতধর্মী প্রকট জিন সমভাবে কাজ করে দুটি জিনের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে তখন তাকে সমপ্রকটতা বলে। এতে মেন্ডেলিয়ান 3 ঃ 1 অনুপাতটি পরিবর্তিত হয়ে 1 ঃ 2 ঃ 1 রূপে প্রকাশ পায়। কালো ও সাদা বর্ণের আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে সমপ্রকটতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে কালো পালক (BB) এবং সাদা পালকের (WW) মোরগ-মুরগিতে ক্রস ঘটানো হলে F_1 জনুর সকল মোরগ-মুরগিই কালো বা সাদা না হয়ে সমপ্রকটতার কারণে কালোর মাঝে সাদা ছোপযুক্ত হয় (BW) এবং দেখতে অনেকটা নীল বর্ণের মনে হয়। ফলাফল নিচে দেয়া হলো-

F_1 জনুর ফলাফল

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ → কালো পালক বিশিষ্ট মোরগ ♂ × সাদা পালক বিশিষ্ট মুরগি ♀

প্যারেন্ট জিনোটাইপ → BB × WW

গ্যামিট (জননকোষ) → B, B, W, W

নিষেক →

F_1 জনুর জিনোটাইপ → BW, BW, BW, BW

F_1 জনুর ফিনোটাইপ → কালোর মাঝে সাদা ছোপযুক্ত মোরগ-মুরগি (নীল)

F_2 জনুর ফলাফল

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ → কালোর মাঝে সাদা ছোপযুক্ত মোরগ ♂ × কালোর মাঝে সাদা ছোপযুক্ত মুরগি ♀

প্যারেন্ট জিনোটাইপ → BW × BW

গ্যামিট (জননকোষ) → B, W, B, W

F_2 জনুর নিষেকের ফলাফল নিচের পানেট চেকারবোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো-

CamScanner

♂ গ্যামিট / ♀ গ্যামিট	B	W
B	BB কালো	BW ছোপযুক্ত
W	BW ছোপযুক্ত	WW সাদা

নিষেক

ফিনোটাইপিক অনুপাত, কালো ঃ ছোপযুক্ত ঃ সাদা = 1 ঃ 2 ঃ 1

অর্থাৎ মনোহাইব্রিড ক্রসের জিনোটাইপিক অনুপাতের সমান।

৩। লিথাল জিন (Lethal gene) -ফলাফল 2 ঃ 1

যেসব জিন জীবের মৃত্যু ঘটায় তাদের লিথাল জিন বা মারণ জিন বলে। জিন বা DNA এর কোনো অংশে মিউটেশনের কারণে এটি ঘটে। একে লিথাল মিউটেশন (lethal mutation) বলে। মানুষসহ অনেক জীবের দেহে এক বা একাধিক লিথাল জিন থাকে। লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য হলো-

- লিথাল জিন প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।
- প্রকট লিথাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায়ই জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় জীবের মৃত্যু ঘটায়।
- জাইগোট বা ভ্রূণ অবস্থায় জীব মারা যায় বলে লিথাল জিনের প্রভাব চোখে পড়ে না, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রকাশ ঘটে।
- লিথাল জিন মেন্ডেলিয়ান 3 ঃ 1 অনুপাত পরিবর্তন করে 2 ঃ 1 অনুপাতে জীবের প্রকাশ ঘটায়।
- লিথাল জিনের কারণে মানুষের হিমোফিলিয়া ও থ্যালামেসিয়া রোগ হয়।

লিথাল জিনের কারণে মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের রূপান্তর দুভাবে ঘটে, যথা-

(১) প্রচ্ছন্ন লিথাল জিন এবং

(২) প্রকট লিথাল জিন।

ফরাসী বিজ্ঞানী এল. ক্যুঁয়েনো (Lucien Cuenot) 1905 সালে ইঁদুরের গাত্রবর্ণ প্রকাশে অসম্পূর্ণ প্রকট প্রকৃতির লিথাল জিনের উপস্থিতি বর্ণনা করেন। প্রকৃতিতে হলুদ ও অ্যাগাউটি (সোনালী-বাদামী) বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায়। হলুদ বর্ণের জিন Y অ্যাগাউটি বর্ণের জিন y এর উপর প্রকট। বিশুদ্ধ হলুদ বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ YY এবং বিশুদ্ধ অ্যাগাউটি বর্ণের জিনোটাইপ yy। কিন্তু প্রকৃতিতে যেসব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তাদের কোনোটিই বিশুদ্ধ হোমোজাইগাস (YY) জিনোটাইপ বিশিষ্ট নয়। কারণ Y জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথাল জিনরূপে ক্রিয়া করে ভ্রূণাবস্থায় ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়। ক্যুঁয়েনো পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন প্রকৃতিতে যেসব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তাদের সকলেই সংকর Yy প্রকৃতির। তাই দুটি হলুদ বর্ণের ইঁদুরের মধ্যে ক্রস ঘটানো হলে মেন্ডেলিয়ান 3 ঃ 1 অনুপাতের পরিবর্তে 2 ঃ 1 অনুপাতে হলুদ ও অ্যাগাউটি বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায়। নিম্নের ছকের মাধ্যমে এটি দেখানো হলো -

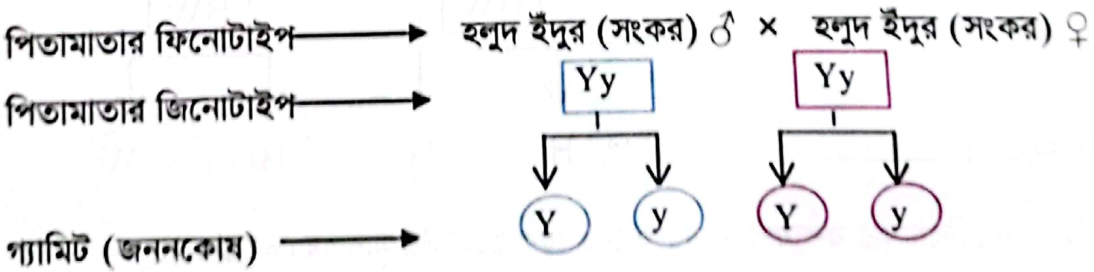

CamScanner

নিষেকের ফলাফল নিচের পানেট চেকারবোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো-

♀ গ্যামিট / ♂গ্যামিট	Y	y
Y	YY (মারা যায়)	Yy (হলুদ)
y	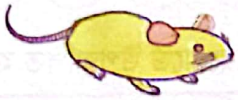 Yy (হলুদ)	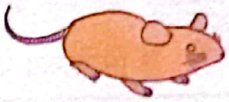 yy (অ্যাগাউটি)

YY জিনোটাইপ বিশিষ্ট ইঁদুর লিথালিটির কারণে ভ্রূণাবস্থায় মারা যায়।

৪। পরিপূরক জিন (Complementary gene) - ফলাফল 9 ঃ 7

ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি ভিন্ন ধরনের প্রকট জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ায় নতুন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটলে এ ধরনের জিনকে পরিপূরক জিন বলে। পরিপূরক জিনের ক্রিয়ায় মেন্ডেলিয়ান ডাইহাইব্রিড ক্রসের F_2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত 9 ঃ 3 ঃ 3 ঃ 1 এর পরিবর্তে 9 ঃ 7 হয়।

উদাহরণ ও জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা: বেটসন ও পানেট (Bateson and Punnett) নামক দুজন জিনতাত্ত্বিক 1904 সালে মিষ্টি মটরশুঁটির সংকরায়ন দ্বারা পরিপূরক জিনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মিষ্টি মটরশুঁটির *Lathyrus odoratus* প্রজাতির উদ্ভিদের দুটি প্রকরণে সাদা বর্ণের ফুল পাওয়া যায়। এদের জিনোটাইপ -(i) CCpp (ii) ccPP. এ দুধরনের জিনোটাইপ বিশিষ্ট সাদা ফুলধারী মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস ঘটানো হলে F_1 জনুর সকল উদ্ভিদই বেগুনি ফুলধারী হয়। F_1 জনুর উদ্ভিদের স্বপরাগায়ণে সৃষ্ট F_2 জনুতে বেগুনি ও সাদা ফুলধারী উদ্ভিদের অনুপাত হয় 9 ঃ 7। প্রকৃতপক্ষে মটরশুঁটির বেগুনি রঙের জন্য দায়ী হলো অ্যান্থোসায়ানিন (anthocyanin) নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনতত্ত্ববিদ আর এমারসন (R. Emerson) লক্ষ করেন মটরশুঁটি ফুলের রঙের জন্য দায়ী অ্যান্থোসায়ানিনের কার্যকারিতা দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের যে কোনো একটির বা উভয়টির অভাবে সাদা ফুলের সৃষ্টি হয়। নিম্নে বর্ণিত ছকের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করা হলো-

F_1 জনুর ফলাফল

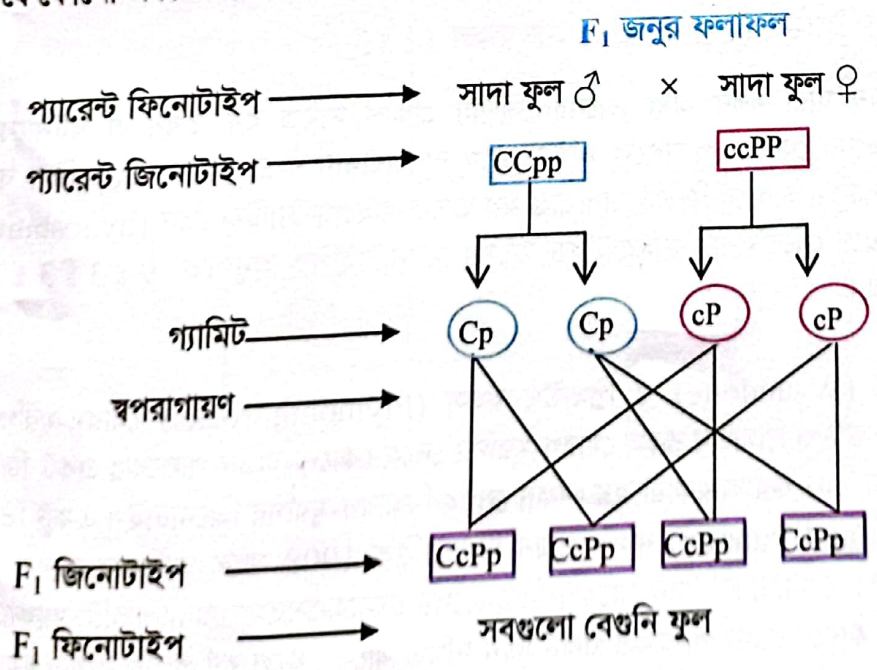

মটরশুটির সাদা ফুল

মটরশুটির বেগুনি ফুল

F_2 জনুর ফলাফল

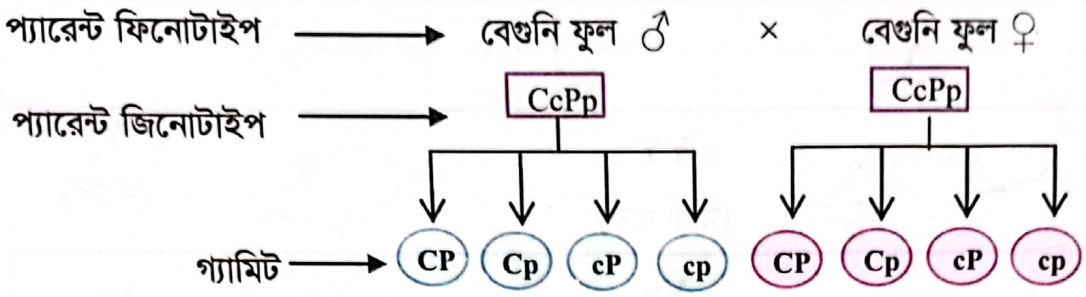

নিষেকের ফলাফল নিচের পানেট চেকারবোর্ডে উপস্থাপিত হলো-

♀ গ্যামিট / ♂ গ্যামিট	CP	Cp	cP	cp
CP	CCPP বেগুনি ফুল	CCPp বেগুনি ফুল	CcPP বেগুনি ফুল	CcPp বেগুনি ফুল
Cp	CCPp বেগুনি ফুল	CCpp সাদা ফুল	CcPp বেগুনি ফুল	Ccpp সাদা ফুল
cP	CcPP বেগুনি ফুল	CcPp বেগুনি ফুল	ccPP সাদা ফুল	ccPp সাদা ফুল
cp	CcPp বেগুনি ফুল	Ccpp সাদা ফুল	ccPp সাদা ফুল	ccpp সাদা ফুল

F_2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত, বেগুনি ঃ সাদা = 9 ঃ 7

উপরের চেকারবোর্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় যেসব জিনোটাইপে C জিন (colour factor) এবং P জিন (pur factor) উভয়েই বিদ্যমান থাকে সেগুলোর ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য বেগুনি হয়েছে। এ দুটি জিনের যে কোনো এক বা উভয়টি যেসব জিনোটাইপে অনুপস্থিত সেগুলোর ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য সাদা হয়েছে। অর্থাৎ C ও P জিন এ অপরের পরিপূরক এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়ায় মটরশুঁটি ফুলের বেগুনি রঙ প্রকাশ পায়।

৫। এপিস্ট্যাসিস (Epistasis) -ফলাফল 13 ঃ 3

পরস্পর অ্যালিল নয় এমন একটি জিন দ্বারা যখন অন্য জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ দমিত হয় তখন এ ঘটনা এপিস্ট্যাসিস বলে। যে জিনটি অন্য জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশকে দমিত রাখে বা বাধাদান করে তাকে বাধক জিন এপিস্ট্যাটিক জিন (epistatic gene) বলে। আর যে জিনটি বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন (hypost gene) বলে। এপিস্ট্যাটিক ঘটনার কারণে মেন্ডেলিয়ান ডাইহাইব্রিড ক্রসের ফিনোটাইপিক অনুপাত 9 ঃ 3 ঃ 3 পরিবর্তিত হয়ে 13 ঃ 3 রূপে প্রকাশ পায়।

উদাহরণ

লেগহর্ণ (Leghorns), ওয়াইনডট (Wyandotte) ও প্লিমাউথ রকস (Plymouth rocks) মোরগ-মু পালকের রঙ সাদা। এদের মধ্যে ওয়াইনডট ও প্লিমাউথ রকস মোরগ-মুরগির দেহে কোনো রঙিন পালকের প্রকট থাকে না বলে এরা প্রাকৃতিকভাবেই সাদা পালকের অধিকারী হয়। কিন্তু লেগহর্ণ মোরগ-মুরগির জিনোটাইপ একটু প্রকৃতির। বেটসন ও পানেট (Bateson and Punnett) নামক দুজন জিনতাত্ত্বিক 1908 সালে আবিষ্কার করে লেগহর্ণ জাতের মোরগ-মুরগিতে রঙিন পালকের প্রকট জিন থাকে। কিন্তু এদের ক্রোমোসোমের অন্য একটি লো একটি বা দুটি এপিস্ট্যাটিক জিন থাকার কারণে রঙিন পালকের প্রকট জিন দমিত থাকে, ফলে বর্ণ প্রকাশ ব্যহত

সাদা লেগহর্ণ ও সাদা ওয়াইনডটস মোরগ-মুরগিতে ক্রস ঘটালে দেখা যায় F_1 জনুর সকল মোরগ-মুরগিই সাদা বর্ণের পালকের অধিকারী হয়। F_1 জনুর সংকর মোরগ-মুরগিতে আন্তঃপ্রজনন ঘটানো হলে সাদা ও রঙিন উভয় ধরনের মোরগ-মুরগিই পাওয়া যায় এবং তাদের অনুপাত হয় 13 ঃ 3 । অর্থাৎ, সাদা ঃ রঙিন = 13 ঃ 3.

রঙিন পালকের জিনকে C এবং এপিস্ট্যাটিক জিনকে I প্রতীকে চিহ্নিত করলে হোমোজাইগাস সাদা লেগহর্ণ মোরগ-মুরগির জিনোটাইপ হয় CCII এবং প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির হওয়ায় সাদা ওয়াইনডট মোরগ-মুরগির জিনোটাইপ হয় ccii। এদের মধ্যে ক্রসে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের ছক ও পানেট চেকারবোর্ডে দেখানো হলো-

F_1 জনুর ফলাফল

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ → সাদা লেগহর্ণ ♂ × সাদা ওয়াইনডট ♀

প্যারেন্ট জিনোটাইপ → CCII × ccii

গ্যামিট → CI, CI × ci, ci

নিষেক →

F_1 জিনোটাইপ → CcIi, CcIi, CcIi, CcIi

F_1 ফিনোটাইপ → সকলেই সাদা মোরগ-মুরগি

লেগহর্ণ

ওয়াইনডট

প্লিমাউথ রকস

রঙিন লেগহর্ণ ও ওয়াইনডট

F_2 জনুর ফলাফল

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ → সাদা (সংকর) মোরগ ♂ × সাদা (সংকর) মুরগি ♀

প্যারেন্ট জিনোটাইপ → CcIi × CcIi

গ্যামিট → CI, Ci, cI, ci × CI, Ci, cI, ci

নিষেকের ফলাফল নিচের প্যানেট চেকারবোর্ডে উপস্থাপিত হলো-

♀ গ্যামিট / ♂ গ্যামিট	CI	Ci	cI	ci
CI	CCII সাদা	CCIi সাদা	CcII সাদা	CcIi সাদা
Ci	CCIi সাদা	CCii রঙিন	CcIi সাদা	Ccii রঙিন
cI	CcII সাদা	CcIi সাদা	ccII সাদা	ccIi সাদা
ci	CcIi সাদা	Ccii রঙিন	ccIi সাদা	ccii সাদা

F_2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত, সাদা ঃ রঙিন = 13 ঃ 3

উপরোক্ত চেকার বোর্ডের জিনোটাইপ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এপিস্ট্যাটিক জিন I এর উপস্থিতিতে রঙিন পালকের জিন C প্রকাশ পায় না। C জিন বিশিষ্ট জিনোটাইপ তখনই রঙিন পালক প্রকাশ করে যখন সেখানে I জিন অনুপস্থিত থাকে।

CamScanner

৬। দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস (Duplicate Recessive Epistasis) ফলাফল 9 : 7

ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী দুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন জিন যখন ভিন্ন লোকাসে অবস্থান করে একে অপরের প্রকট অ্যালিলকে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তখন তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। মানুষের জন্মগত মুক-বধিরতা দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের উদাহরণ।

কিছু মানুষ জন্মগতভাবে কথা বলতে ও কানে শুণতে অক্ষম হয়। এদের মুক-বধির (deaf and mute) বলে। দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুইজোড়া প্রচ্ছন্ন জিন দ্বারা মানুষের মুক-বধিরতা নিয়ন্ত্রিত হয়। দুইজোড়া জিন এমনভাবে আন্তঃক্রিয়া করে যে এদের যে কোনো একজোড়া প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকলেই মানুষ মুক-বধির হয়। তবে এসব জিন হেটারোজাইগাস অবস্থায় থাকলে মানুষ স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম হয়ে থাকে। ফলে মুক-বধির পিতামাতার সন্তান যেমন স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম হতে পারে তেমনি স্বাভাবিক পিতামাতার সন্তানও মুক-বধির হতে পারে।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা: বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তির প্রচ্ছন্ন জিনকে যথাক্রমে m ও d দ্বারা চিহ্নিত করলে দুধরনের জিনোটাইপ বিশিষ্ট মানুষ মুক-বধির হবে। এরা হলো- (i) ddMM ও (ii) DDmm।

F_1 জনুর ফলাফল

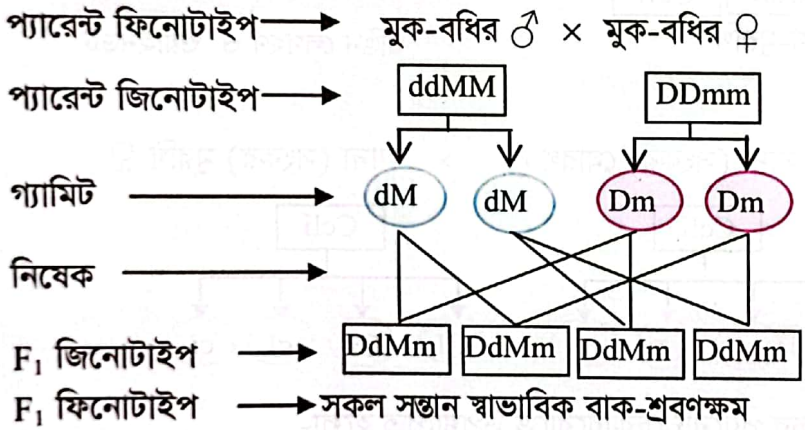

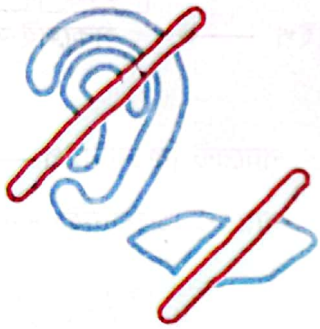

মুক-বধির প্রতীক

উপরোক্ত জিনোটাইপধারী একজন মুক-বধির পুরুষের সাথে একজন মুক-বধির মহিলার বিয়ে হলে তাদের সকল সন্তান (F_1) স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম হবে। উক্ত সন্তানদের জিনোটাইপের অনুরূপ জিনোটাইপধারী পুরুষ ও মহিলার বিয়ে হলে (মানুষের ভাই-বোনের বিয়ে হয় না) তাদের সৃষ্ট পরবর্তী বংশধরে (F_2) স্বাভাভিক বাক-শ্রবণক্ষম ও মুক-বধির সন্তান 9 : 7 অনুপাতে প্রকাশ পাবে। উপরে ও নিম্নে বর্ণিত ছকের মাধ্যমে এটি ব্যাখ্যা করা হলো-

F_2 জনুর ফলাফল

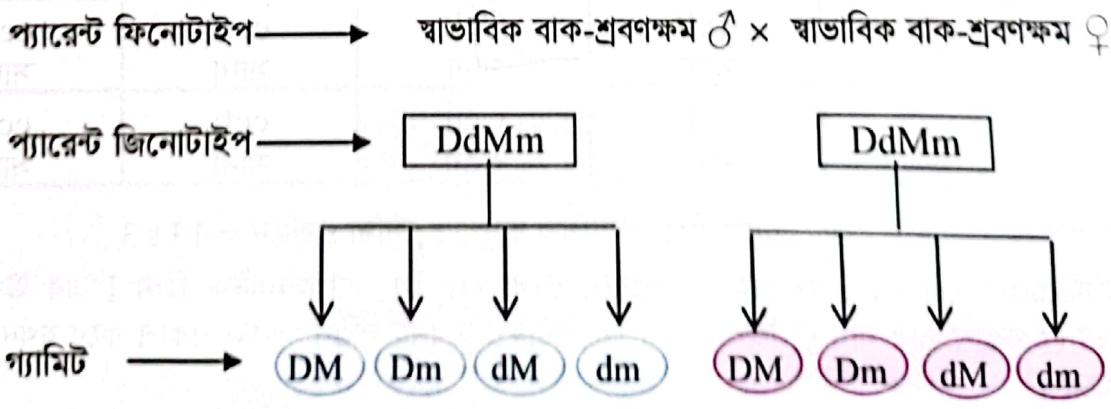

CamScanner

নিষেকের ফলাফল নিচের প্যানেট চেকারবোর্ডে উপস্থাপিত হলো-

♀ গ্যামিট / ♂ গ্যামিট	DM	Dm	dM	dm
DM	DDMM বাক-শ্রবণক্ষম	DDMm বাক-শ্রবণক্ষম	DdMM বাক-শ্রবণক্ষম	DdMm বাক-শ্রবণক্ষম
Dm	DDMm বাক-শ্রবণক্ষম	DDmm মুক-বধির	DdMm বাক-শ্রবণক্ষম	Ddmm মুক-বধির
dM	DdMM বাক-শ্রবণক্ষম	DdMm বাক-শ্রবণক্ষম	ddMM মুক-বধির	ddMm মুক-বধির
dm	DdMm বাক-শ্রবণক্ষম	Ddmm মুক-বধির	ddMm মুক-বধির	ddmm মুক-বধির

F_2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত, বাক-শ্রবণক্ষম ঃ মুক-বধির = 9 ঃ 7

উপরোক্ত চেকারবোর্ডের জিনোটাইপ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোনো জিনোটাইপে দ্বৈত এপিস্ট্যাটিক জিন dd অথবা mm এর উপস্থিতিতে মানুষের মুক-বধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এসব ক্ষেত্রে প্রকট জিন থাকলেও তাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে না।

১১.৪ পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (Polygenic inheritance)

যেসব বংশগতিয় বাহ্যিক বা ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য ক্রোমোসোমের বিভিন্ন লোকাসে (নন অ্যালিলিক) অবস্থিত দুইয়ের অধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরিমাপ দ্বারা যাদের মাত্রা নির্ণয় করা হয় তাদের বহুজিনীয় বংশগতি বা পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বলে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য মেন্ডেলের বংশগতিয় নিয়ম মেনে চলে না এবং জীবগোষ্ঠীতে এদের মাত্রা পরিমাপ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তা লেখচিত্রে উপস্থাপন করলে একটি ঘণ্টাকৃতির (bell shaped) চিত্র পাওয়া যায়। মানুষের উচ্চতা, গাত্রবর্ণ, ওজন, চোখের বর্ণ, বুদ্ধিমত্তা ও আচরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পলিজেনিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের অনেক বংশগতিয় রোগ পলিজেনিক জিনের অস্বাভাবিকতার কারণে সৃষ্টি হয়, যেমন- অটিজম (autism), ক্যানসার (cancer), ডায়াবেটিস টাইপ 2 (diabetes type 2) ইত্যাদি।

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্সের বৈশিষ্ট্য হলো:

১। দুই বা তধোধিক জিন দ্বারা ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। গণনার চেয়ে পরিমাপ দ্বারা এদের মাত্রা নির্ণয় করা হয়।

৩। জীবের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায়।

চিত্র: পলিজেনিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষের চোখ ও গাত্র বর্ণ

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স-এর ব্যাখ্যা

মানুষের উচ্চতা পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স প্রকৃতির। কিন্তু কতগুলো জিন এর সাথে জড়িত এবং কীভাবে এরা কাজ করে এটি আজও অজানা রয়েছে। ধারণা করা হয় তিন ধরনের জিন তিনটি ভিন্ন লোকাসে থেকে মানুষের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে। তিন ধরনের জিনকে A, B ও C দ্বারা চিহ্নিত করলে এদের নিম্নরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়:

CamScanner

- A, B, ও C সর্বদা জিনের প্রকট অবস্থা এবং a, b ও c জিনের প্রচ্ছন্ন অবস্থা।
- প্রতিটি প্রকট জিনের (A অথবা B অথবা C) উপস্থিতি মানুষের উচ্চতা 3 ইঞ্চি বৃদ্ধি করে।
- প্রতিটি প্রকট জিনের প্রকাশ ক্ষমতা সমান অর্থাৎ **A = B = C.**

প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস (aabbcc) পুরুষ 5 ফুট এবং প্রচ্ছন্ন হোমোজাইগাস (aabbcc) মহিলা 4 ফুট 7 ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। কোনো জনগোষ্ঠীর AaBbCc জিনোটাইপ বিশিষ্ট মাঝারি উচ্চতার পুরুষ (5'9") ও মহিলাদের (5'4") মধ্যে বিয়ে হলে তারা নিম্নলিখিত উপায়ে জননকোষ উৎপাদন করবে:

প্যারেন্ট ফিনোটাইপ	পুরুষ (5'9")	মহিলা (5'4")
প্যারেন্ট জিনোটাইপ	AaBbCc	AaBbCc
গ্যামিট (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু)	ABC, ABc, AbC, aBC, abC, aBc, Abc, abc	

প্রাপ্ত গ্যামিটগুলোকে F_2 জনুর পানেট চেকার বোর্ডে স্থাপন করলে যে ফলাফল পাওয়া যাবে তার সারসংক্ষেপ হলো:

জিনোটাইপ	পুরুষের উচ্চতা	মহিলার উচ্চতা	ফ্রিকোয়েন্সি (গণসংখ্যা)
AABBCC	6'6"	6'1"	1/64
AaBBCC ইত্যাদি	6'3"	5'10"	6/64
AaBbCC ইত্যাদি	6'0"	5'7"	15/64
AaBbCc ইত্যাদি	5'9"	5'4"	20/64
AaBbcc ইত্যাদি	5'6"	5'1"	15/64
Aabbcc ইত্যাদি	5'3"	4'10"	6/64
aabbcc	5'0"	4'7"	1/64

উপরোক্ত ফলাফলকে লেখচিত্রের (graph) মাধ্যমে প্রকাশ করলে একটি ঘণ্টা আকৃতির (bell shaped) চিত্র নিম্নরূপে প্রকাশ পায়-

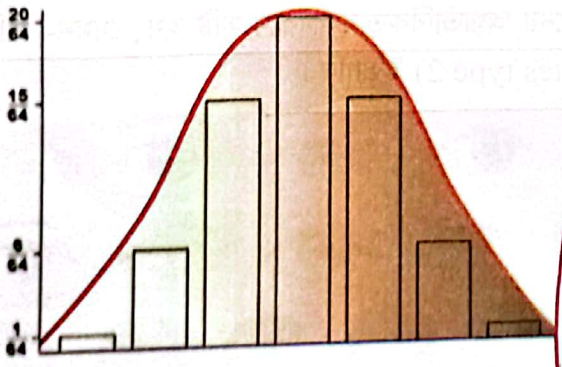

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স এবং মালটিপল অ্যালিল এক নয়

অনেকে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স এবং মালটিপল অ্যালিলকে একই মনে করেন। কিন্তু দুটি এক নয়। পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স এর ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের বিভিন্ন লোকাসে অবস্থিত বিভিন্ন জিন একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মালটিপল অ্যালিল (multiple allele)-এর ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের একই লোকাসের একটি জিনের বিভিন্ন মিউটেটেড (mutated) রূপ একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।

১১.৫ লিঙ্গ নির্ধারণ (XX-XY, XX-XO) নীতি

লিঙ্গ প্রতিটি জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। উচ্চশ্রেণির প্রতিটি প্রাণীতেই সার্বজনীনভাবে পুরুষ ও স্ত্রী এ দুধরনের লিঙ্গের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গের প্রাণীতে অনেক বাহ্যিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একে যৌন দ্বি-রূপতা (Sexual dimorphism) বলে। কীভাবে জীবজগতে লিঙ্গের এ পার্থক্য ও বিকাশ ঘটে তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে কৌতূহল রয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে অনাগত সন্তান পুত্র না কন্যা হবে তা নিয়ে নবদম্পতি, পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়। তবে গর্ভের সন্তান পুত্র বা কন্যা হওয়ার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

CamScanner

যে জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীবের লিঙ্গ সংক্রান্ত বৈশিষ্টাবলী অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination) বলে। লিঙ্গ কীভাবে নির্ধারিত হয়? এর কলাকৌশল কী? শত শত বছর ধরে সাধারণ মানুষসহ বিজ্ঞানীগণ এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন। এব্যাপারে বিভিন্ন রকম ভ্রান্ত কল্পনা ও অনুমান বিভিন্ন সময়ে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু 1900 সালের পূর্ব পর্যন্ত এ সমস্যার কোনো সন্তোষজনক সমাধান মেলেনি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জিনতত্ত্বের সূচনার সাথে সাথে বিজ্ঞানীগণ এ সংক্রান্ত একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাদানে সামর্থ হয়েছেন।

লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্কিত ক্রোমোসোমীয় মতবাদ

সাটন ও বোভারি (Sutton and Boveri) 1902 সালে বংশগতির ক্রোমোসোমীয় তত্ত্বে সকল জিন ক্রোমোসোমে থাকার কথা ঘোষণা দেন। একই সময়ে ম্যাক ক্লাঙ (Mc Clung) মত প্রকাশ করেন যে প্রাণীর অর্ধেক শুক্রাণু X বডি (X body) নামক গঠন বহণ করে যা লিঙ্গ নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে 1905 সালে X বডিকে X ক্রোমোসোম হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং একই সাথে Y ক্রোমোসোম আবিষ্কৃত হয়। এদেরকে একত্রে সেক্স ক্রোমোসোম (sex chromosome=X and Y) এবং অন্যান্য সকল ক্রোমোসোমকে অটোসোম (autosome-A) নামে আখ্যায়িত করা হয়। স্টিভেন্স (Stevens), উইলসন (Wilson), মর্গান (Morgan) প্রমূখ বিজ্ঞানী প্রাণীর লিঙ্গ নির্ধারণে সেক্স ক্রোমোসোমের ভূমিকার গবেষণালব্ধ কৌশল পদ্ধতির বিবরণ দেন। সেক্স ক্রোমোসোম পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত উপায়ে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়:

ধরন	হেটারোজাইগাস	শুক্রাণু	ডিম্বাণু	স্ত্রী	পুরুষ	যেসব প্রাণীতে ঘটে
XX-XY	পুরুষ	X ও Y	X	XX	XY	*Drosophila*, মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ী
XX-XO	পুরুষ	X ও O	X	XX	XO	ঘাসফড়িং, গান্ধিপোকা, ছারপোকা, তেলাপোকা ইত্যাদি
ZZ-ZW	স্ত্রী	Z	Z ও W	ZW	ZZ	পাখি, প্রজাপতি ও কিছু মাছ
ZZ-ZO	স্ত্রী	Z	Z ও O	ZO	ZZ	কিছু মথ ও প্রজাপতি

XX-XY লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

মানুষ, স্তন্যপায়ী ও কিছু পতঙ্গ যেমন- *Drosophila* তে XX-XY পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। স্টিভেন ও উইলসন (N. Stevens and E.B. Wilson) 1905 সালে প্রথম পৃথকভাবে XX-XY লিঙ্গ নির্ধারণ কৌশল আবিষ্কার করেন। মানুষের একটি ডিপ্লয়েড কোষে 46টি ক্রোমোসোম থাকে। এদের মধ্যে 44টি বা 22 জোড়াকে অটোসোম (autosome=A) এবং 2টি বা এক জোড়াকে সেক্স ক্রোমোসোম (sex chromosome=X or Y) বা অ্যালোসোম (allosome) বা ইডিওক্রোমোসোম (idiochromosome) বলে। দুটি সেক্স ক্রোমোসোমের একটি X এবং অপরটি Y নামে পরিচিত। লিঙ্গ নির্ধারণে এরা প্রধান ভূমিকা পালন করে। অটোসোমগুলো শারীরবৃত্তীয় অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করে, লিঙ্গ নির্ধারণে এদের কোনো ভূমিকা নেই।

স্ত্রীলোকের ডিপ্লয়েড কোষে 22 জোড়া অটোসোম (2A) এবং একজোড়া X ক্রোমোসোম থাকে। যৌন জননের সময় মিওসিস কোষ বিভাজন দ্বারা এরা কেবল এক ধরনের যেমন- (A+X) হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু উৎপাদন করে। এজন্য এদের হোমোগ্যামিটিক স্ত্রী (homogametic female) বলে। অপরপক্ষে পুরুষের ডিপ্লয়েড কোষে 22 জোড়া অটোসোম (2A) এবং একটি X ও একটি Y ক্রোমোসোম থাকে। যৌন জননের সময় মিওসিস কোষ বিভাজন দ্বারা এরা দুধরনের অর্থাৎ- অর্ধেক (A+X) ও অর্ধেক (A+Y) হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু উৎপাদন করে। এজন্য এদের হেটারোগ্যামিটিক পুরুষ (heterogametic male) বলে। একটি ডিম্বাণু কেবল (A+X) অথবা (A+Y) বহনকারী শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হতে পারে। ফলে জাইগোটে সেক্স ক্রোমোসোম হিসেবে দুটি X নতুবা একটি X ও একটি Y ক্রোমোসোমের আবির্ভাব ঘটে। দুটি X নিয়ে যে শিশু (2A+XX) জন্মাবে সেটি হবে কন্যা এবং একটি X ও একটি Y নিয়ে যে শিশু (2A+XY) জন্মাবে সেটি হবে পুত্র সন্তান। পুত্র ও কন্যা সন্তানের অনুপাত হয় 1 ঃ 1।

CamScanner

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের কলাকৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দেয়ার ব্যাপারে মায়ের কোনো ভূমিকা নেই কেননা মায়ের উৎপাদিত সকল ডিম্বাণুতে কেবল X ক্রোমোসোম থাকে। বাবার শুক্রাণুর অর্ধেক X এবং অর্ধেক Y ক্রোমোসোম থাকায় পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বাবাই দায়ী। আমাদের সমাজে এ অজ্ঞতার কারণে কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার ব্যাপারে মাকে অযথাই দায়ী করা হয়।

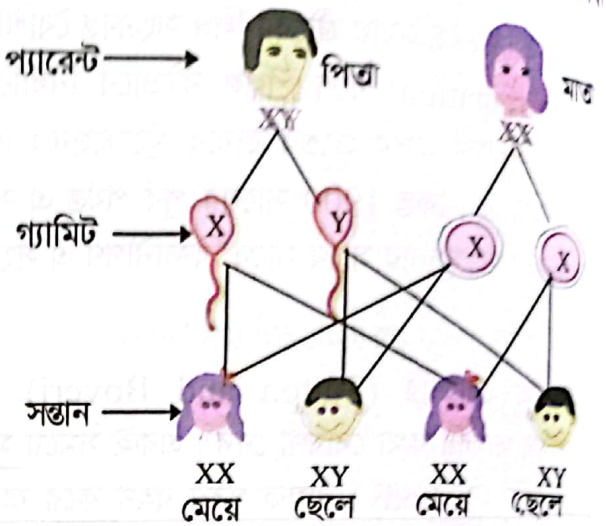

চিত্র ১১.২ মানুষের XX-XY লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

Y ক্রোমোসোম মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে কীভাবে ভূমিকা রাখে?

মানুষের জাইগোটে Y ক্রোমোসোমের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। Y ক্রোমোসোমে SR (sex-determining region Y) নামক একটি বিশেষ জিন থাকে যা মানুষের পুরুষত্ব প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ ক গবেষণায় দেখা গেছে Y ক্রোমোসোমে এ SRY জিন না থাকার কারণে (22A+XY) ক্রোমোসোমবাহী মানু লিঙ্গধারী হয় এবং Y ক্রোমোসোমের SRY জিনের অংশ বিদ্যমান থাকার কারণে (22A+XXY) ক্রোমোসোম মানুষ বন্ধ্যা প্রকৃতির পুরুষ লিঙ্গধারী হয়।

XX-XO লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

ঘাসফড়িং, গান্ধিপোকা, ছারপোকা, তেলাপোকা ইত্যাদিতে XX-XO পদ্ধতিতে লিঙ্গ নিধারিত হয়। এদের স্ত্রী হোমোগ্যামিক অর্থাৎ ডিপ্লয়েড কোষে পূর্ণ সেট অটোসোমের সাথে একজোড়া X ক্রোমোসোম থাকে। যৌন জননে সময় মিওসিস কোষ বিভাজন দ্বারা এরা কেবল এক ধরনের, যেমন- (A+X) হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু উৎপাদন করে অপরপক্ষে পুরুষের ডিপ্লয়েড কোষে পূর্ণ সেট অটোসোম এবং একটি X ক্রোমোসোম থাকে, কোনো Y ক্রোমোসো থাকে না। Y ক্রোমোসোমের অনুপস্থিতি একটি শূন্য (zero, O) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যৌন জননের সময় মিওসি কোষ বিভাজন দ্বারা এরা দুধরনের অর্থাৎ- অর্ধেক (A+X) ও অর্ধেক (A+O) হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু উৎপাদন করে একটি ডিম্বাণু কেবল (A+X) অথবা (A+O) বহনকারী শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হতে পারে। ফলে জাইগোটে সে ক্রোমোসোম হিসেবে দুটি X নতুবা একটি X ক্রোমোসোমের আবির্ভাব ঘটে। দুটি X নিয়ে সৃষ্ট অপত্য বংশধর (2 + XX) স্ত্রী এবং একটি X নিয়ে সৃষ্ট অপত্য বংশধর (2A + XO) পুরুষ হয়। পুরুষ ও স্ত্রী সন্তানের অনুপাত ১ ঃ ১.

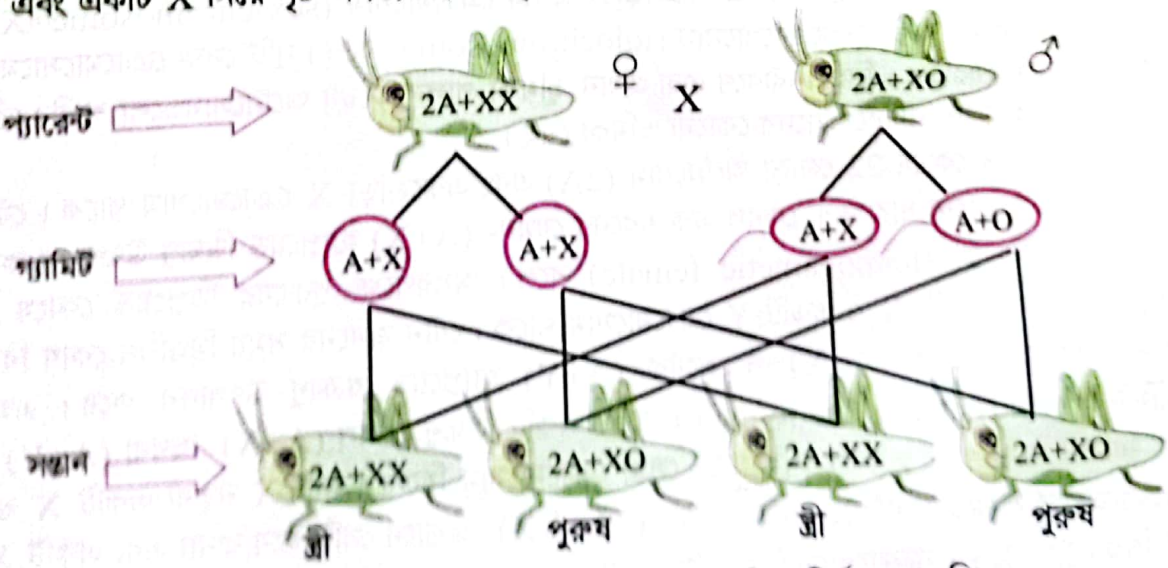

চিত্র ১১.৩ ঘাস ফড়িংয়ের XX-XO লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি

CamScanner

১১.৬ সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার (Sex Linked Disorder)

যেসব ক্রোমোসোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে অর্থাৎ জীবের পুরুষ কিংবা স্ত্রী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের সেক্স ক্রোমোসোম (sex chromosome) বলে। মানুষের 23 জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে মাত্র একজোড়া সেক্স ক্রোমোসোম। এদের X ও Y দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো সেক্স ক্রোমোসোমে বিদ্যমান জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব বৈশিষ্ট্যকে লিঙ্গজড়িত বৈশিষ্ট্য (sex-linked traits) বলে। লিঙ্গজড়িত বৈশিষ্ট্যের সেক্স ক্রোমোসোমের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়াকে লিঙ্গজড়িত বংশগতি বা সেক্স লিঙ্কড ইনহেরিট্যান্স (sex-linked inhertance) বলে। মানুষের যেসব জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতিয় রোগ সেক্স ক্রোমোসোমের (X ও Y) মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের **সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার** (sex linked disorder) বা **লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতা** বলে। মানুষের X জিন নিয়ন্ত্রিত এরকম কয়েকটি রোগ হলো লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (red-green colorblindness), হিমোফিলিয়া (hemophilia), ডুসেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি (Duchenne Muscular Dystrophy)। মানুষের Y জিন নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য হলো কানের লোম।

সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার বংশগতি কতগুলো নিয়ম মেনে চলে, যেমন-

১। অধিকাংশক্ষেত্রে এরা X ক্রোমোসোম দ্বারা বাহিত হয়, তবে কিছুক্ষেত্রে Y ক্রোমোসোম দ্বারা বাহিত হয়।

২। এসব রোগের জিন অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির।

৩। এসব অস্বাভাবিকতা মহিলাদের চেয়ে পুরুষে বেশি প্রকাশিত হয়, কারণ পুরুষে এদের জিন উপস্থিত থাকলেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে কিন্তু স্ত্রীদের হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশ ঘটে।

৪। লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতাধারী পুরুষের সকল কন্যা সন্তানই বাহক হবে কিন্তু কোনো পুত্র সন্তানে এ জিন সঞ্চারিত হবে না।

৫। লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতাধারী স্ত্রীর সকল পুত্র সন্তান বৈশিষ্ট্যধারী হবে কিন্তু কন্যারা বাহক হবে।

৬। পিতার লিঙ্গজড়িত অস্বাভাবিকতা কন্যার মাধ্যমে দৌহিত্রে সঞ্চারিত হয়, একে cris-cross inheretance বলে।

	মানুষের কয়েকটি বংশগতিয় (লিঙ্গজড়িত) অস্বাভাবিকতা	
	অস্বাভাবিকতা	লক্ষণ
১.	লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা	লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। আমেরিকার 8% পুরুষ ও 0.5% মহিলাতে দেখা যায়।
২.	হিমোফিলিয়া	রক্ত তঞ্চন বিলম্বিত হয়, ফলে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্ত ক্ষরিত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। পুরুষে দেখা যায়। রাশিয়ান সিজার রাজ বংশে এ রোগ ছিল।
৩.	ডুসেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি	পেশি শক্ত হয়ে যায়, 10 বছর বয়সেই চলন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, 20 বছরের মধ্যে মারা যায়।
৪.	রাতকানা	রাতে কোনো কিছু দেখতে পায় না।
৫.	ফ্রাজাইল X সিনড্রম	অটিজম ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।
৬.	টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন	পুরুষ ধীরে ধীরে স্ত্রীতে পরিণত হয়।
৭.	হাইপারট্রাইকোসিস	সমগ্র দেহে ঘন লোমের উপস্থিতি।
৮.	ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস	অস্বাভাবিক মূত্রত্যাগ, শারীরিক অক্ষমতা।
	মানুষের কয়েকটি বংশগতিয় (লিঙ্গজড়িত নয়) অস্বাভাবিকতা	
১.	ডাউন সিনড্রম	মুখমণ্ডল চ্যাপ্টা, মাথা ও কান ছোট, গ্রীবা খাটো।
২.	সিস্টিক ফাইব্রোসিস	স্থায়ী কাশি, ঘন মিউকাসযুক্ত কফ।
৩.	সিকল সেল অ্যানিমিয়া	রক্তশূণ্যতা, প্রচণ্ড শরীর ব্যাথা, হাত ও পা ফুলে যাওয়া (ক্যানসার)।
৪.	থ্যালাসেমিয়া	রক্তশূণ্যতা, রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরি না হওয়া (ক্যানসার)।
৫.	হান্টিংটন ডিজিসস	দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অনিয়ন্ত্রিত কাঁপুনি বা ঝাঁকুনি (কোরিয়া)
৬.	পারকিনসন ডিজিস	দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাঁপুনি, ভারসাম্য ও সমন্বয়হীনতা।

বর্ণান্ধতা (Colour blindness)

মানুষের চোখের রেটিনাতে কিছু বর্ণসংবেদী কোষ আছে যেগুলো বিভিন্ন বর্ণ শনাক্ত করে। মানুষের X ক্রোমোসো বিদ্যমান একটি জিন দ্বারা এ কোষগুলোর বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মিউটেশনের কারণে এ জিনের একটি প্রচ্ছ অ্যালিল সৃষ্টি হয় যেটি রেটিনার বর্ণসংবেদী কোষগুলোর বিকাশ রহিত করে। ফলে এ প্রচ্ছন্ন জিনধারী মানুষ কতগু বিশেষ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। একে বর্ণান্ধতা (colour blindness) বলে। বর্ণান্ধতা একটি লিঙ্গজ রোগ। মানুষের মধ্যে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (red-green colour blindness) অধিক দেখা যায় এবং প্রায় 95 বর্ণান্ধ মানুষই লাল-সবুজ বর্ণান্ধ। এরা লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। জন ডাল্টন (John Dalto নামক একজন বিজ্ঞানী মানুষের বর্ণান্ধতা সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশ করেন। এজন্য একে ডাল্টোনিজম (Daltonis বলে। বর্ণান্ধতার কোনো চিকিৎসা নেই কিংবা বর্ণান্ধ রোগী কখনোই সুস্থ হয় না। বর্ণান্ধতা শনাক্তকরণ পরীক্ষ সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো ইশিহারা কালার টেস্ট (Ishihara color test)।

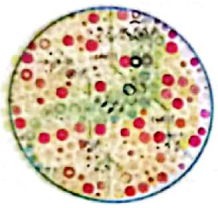

ইরিহারা টেস্ট
বর্ণান্ধ ব্যক্তি বৃত্তের ভেতরের সবুজ বর্ণের টিকটিকিদেখতে পারবে না।

স্বাভাবিক দৃষ্টির মানুষ ফানুসগুলো যেরকম দেখবে

বর্ণান্ধ মানুষ ফানুসগুলো যেরকম দেখবে

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

দৃষ্টির স্বাভাবিক জিন X^C এবং বর্ণান্ধতার জিন X^c হলে মানুষের দৃষ্টিশক্তির জিনোটাইপকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকা কর যায়-

১. স্বাভাবিক দৃষ্টির পুরুষ - X^CY,
২. বর্ণান্ধ পুরুষ- X^cY,
৩. স্বাভাবিক দৃষ্টির মহিলা- X^CX^C
৪. বাহক মহিলা- X^CX^c
৫. বর্ণান্ধ মহিলা- X^cX^c

একজন বর্ণান্ধ পিতার স্বাভাবিক দৃষ্টির কন্যার সাথে অন্য একজন বর্ণান্ধ পিতার স্বাভাবিক দৃষ্টির পুত্রের বিয়ে হ তাদের সন্তানদের দৃষ্টিক্ষমতা কেমন হবে?

মানুষের X ক্রোমোসোমে বিদ্যমান একটি প্রচ্ছন্ন জিন দ্বারা বর্ণান্ধতা নিয়ন্ত্রিত হয়। পুরুষের X ক্রোমোসো বর্ণান্ধের জিন থাকলেই উহা প্রকাশিত হবে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির হওয়ায় মহিলাদের ক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগা অবস্থায় বর্ণান্ধ জিনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির জিন X^C এবং বর্ণান্ধতার জিন X^c । তাহলে বর্ণান্ধ পিতার জিনোটাইপ হবে- X^cY। বর্ণান্ধ পিতা থেকে X^c জিন সকল কন্যা সন্তানে সঞ্চারিত হবে এবং এতে সকল কন্যা স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও এ প্রকৃতপক্ষে বর্ণান্ধতার জিন বহন করবে অর্থাৎ সকল কন্যাই বাহক প্রকৃতির X^CX^c জিনোটাইপ বিশিষ্ট হবে। বর্ণা পিতা থেকে X^c জিন কখনোই পুত্র সন্তানে সঞ্চারিত হয় না। এজন্য বর্ণান্ধ পিতার পুত্র সন্তান স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হ এবং তার জিনোটাইপ অবশ্যই X^CY হবে। এখন X^CX^c জিনোটাইপ বিশিষ্ট বাহক মেয়ের সাথে X^CY জিনোটাই বিশিষ্ট স্বাভাবিক ছেলের বিয়ে হলে নিম্নলিখিত উপায়ে তাদের কন্যা সন্তানদের অর্ধেক স্বাভাবিক ও অর্ধেক বাহক এ পুত্র সন্তানদের অর্ধেক স্বাভাবিক ও অর্ধেক বর্ণান্ধ হবে-

CamScanner

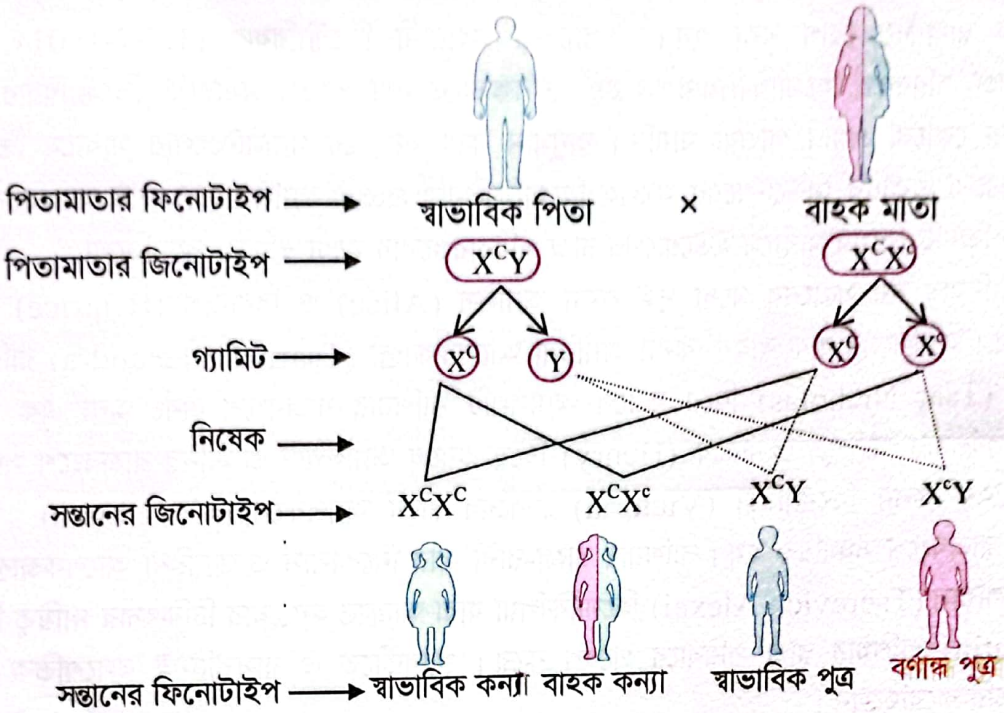

মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা বেশি বর্ণান্ধ হয়

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের (আমেরিকার) 8% পুরুষ এবং 0.5% মহিলা লাল-সবুজ বর্ণান্ধ। এর প্রকৃত কারণ হলো:

১। প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির হওয়ায় মহিলাদের ক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় (X^cX^c) বর্ণান্ধ জিনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু পুরুষের X ক্রোমোসোমে বর্ণান্ধের জিন থাকলেই (X^cY) উহা প্রকাশিত হবে।

২। যদি কোনো মহিলা পিতা বা মাতা একজনের নিকট থেকে বর্ণান্ধতার প্রচ্ছন্ন জিন (X^c) এবং অন্যজনের নিকট থেকে স্বাভাবিক প্রকট জিন (X^C) পায় তাহলে সে হেটারোজাইগাস অবস্থা (X^CX^c) লাভ করে এবং এরা বর্ণান্ধতার জিনের বাহক হয়। বাহক মহিলারা বর্ণান্ধ হয় না। পুরুষের ক্ষেত্রে বাহক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের পিতা-মাতার পুত্র ও কন্যার বর্ণান্ধতার তালিকা দেয়া হলো:

	প্যারেন্ট		কন্যা			পুত্র	
	মাতা	পিতা	স্বাভাবিক	বাহক	বর্ণান্ধ	স্বাভাবিক	বর্ণান্ধ
১।	স্বাভাবিক	বর্ণান্ধ	-	100%	-	100%	
২।	বাহক	স্বাভাবিক	50%	50%	-	50%	50%
৩।	বর্ণান্ধ	স্বাভাবিক	-	100%	-	-	100%
৪।	বাহক	বর্ণান্ধ	-	50%	50%	50%	50%

হিমোফিলিয়া (Haemophilia)

হিমোফিলিয়া হলো মানুষের লিঙ্গ জড়িত বংশগতিয় রক্ত তঞ্চন অস্বাভাবিকতা। মানুষের X ক্রোমোসোমে বিদ্যমান একটি প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির জিন দ্বারা এ রোগ নিয়ন্ত্রিত ও বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এ জিনের প্রকট অ্যালিল নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর সংশ্লেষণের মাধ্যমে রক্ত জমাট বাঁধার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। হিমোফিলিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কোথাও সামান্য ক্ষত সৃষ্টি হলে ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট না বেঁধে অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকে। এ ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বর্ণান্ধতা রোগের মতো হিমোফিলিয়ার প্রচ্ছন্ন জিনটি বংশ পরম্পরায় পিতা হতে কন্যার মাধ্যমে পৌত্রকে আক্রান্ত করে অর্থাৎ ক্রিস-ক্রস (criss-cross) সঞ্চারণ নীতি মেনে চলে।

CamScanner

হিমোফিলিয়াকে রাজকীয় রোগ বলা হয়। ইংল্যান্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার (1837-1901) সময় থেকে ইউরোপের কিছু রাজ পরিবারে হিমোফিলিয়ার অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে ধরা পড়ে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার পূর্ব পুরুষে হিমোফিলিয়া রোগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয়, যে গ্যামিটগুলোর মাধ্যমে তিনি গর্ভধারণ করেছিলেন তার কোনো একটির মিউটেশনের ফলেই হিমোফিলিয়ার প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (h) সৃষ্টি হয়েছিলো। মহারানী ভিক্টোরিয়া থেকে এ জিনটি বিয়ের মাধ্যমে ইউরোপের রাজ পরিবারগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নয় সন্তানের মধ্যে দুই কন্যা অ্যালিস (Alice) ও বিয়াট্রিশ (Beatrice) হিমোফিলিক জিনের বাহক ছিলো। অ্যালিসের এক বাহক কন্যা জ্যারিনা আলেকজান্দ্রা (Tsarina Alexandra) রাশিয়ার দ্বিতীয় জার নিকোলাসকে (Tsar Nicholas) বিয়ে করলে অ্যালিলটি রাশিয়ার রাজবংশে এবং অন্য এক বাহক কন্যা আইরিন (Irene) প্রুশিয়ার রাজপুত্র হেনরিকে (Henry) বিয়ে করলে অ্যালিলটি জার্মানির রাজবংশে সঞ্চারিত হয়। বিয়াট্রিশের এক বাহক কন্যা ভিক্টোরিয়া (Victoria) স্পেনের রাজা অ্যালফসোকে (Alfonzo) বিয়ে করলে অ্যালিলটি স্পেনের রাজবংশে সঞ্চারিত হয়। রাশিয়ার রাজা-রানী জার নিকোলাস ও জ্যারিনা আলেকজান্দ্রার একমাত্র পুত্র জারেভিচ অ্যালেক্সিস (Tsarevich Alexei) হিমোফিলিয়া দ্বারা আক্রান্ত হন, যার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে ডাক্তার রাসপুটিন (Rusputin) রাশিয়ার রাজ পরিবারে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে এ রাসপুটিনই বলশেভিক পার্টির রুশ বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করেছিলেন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় 20,000 হিমোফিলিয়া আক্রান্ত রোগী আছে। বিশ্বব্যাপী এ রোগের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই তবে এ সংখ্যা 400,000 এর কম নয় বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশে প্রায় 10,000 হিমোফিলিয়া আক্রান্ত রোগী আছে। হিমোফিলিয়া রোগীর অনেকেই তাদের রোগ সম্পর্কে অবগত নয়।

হিমোফিলিয়ার ধরন

মানুষের দুধরনের হিমোফিলিয়া দেখা যায়, যথা- হিমোফিলিয়া A এবং হিমোফিলিয়া B। রক্ত তঞ্চনে প্রোথম্বিন, ফাইব্রিনোজেন, ক্যালসিয়াম আয়নসহ প্রায় 13 ধরনের ফ্যাক্টর কাজ করে। এদের মধ্যে ফ্যাক্টর VIII ও IX উৎপাদনে অক্ষম মানুষ হিমোফিলিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। হিমোফিলিয়া A এর ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর VIII এবং হিমোফিলিয়া B এর ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর IX উৎপাদনকারী জিনগুলোর মিউটেশন ঘটে ফলে দেহে এসব ফ্যাক্টরের অভাব দেখা দেয়। হিমোফিলিয়া আক্রান্ত রোগীর মধ্যে হিমোফিলিয়া A এর আধিক্য দেখা যায় এবং প্রায় 80% রোগীই হিমোফিলিয়া A দ্বারা আক্রান্ত হয়।

হিমোফিলিয়া রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা

সাধারণত দুবছর বয়স থেকেই হিমোফিলিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। হিমোফিলিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের রক্ত তঞ্চন ক্ষমতা থাকে না ফলে কোথাও সামান্য ক্ষত সৃষ্টি হলে ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট না বেঁধে অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকে। এছাড়া দেহের যে কোনো স্থানে অভ্যন্তরীন রক্তপাত ঘটে থাকে। অস্থিসন্ধি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। সামান্য ব্যায়াম বা দৌড়ানোর সময় দেহের বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে রক্তক্ষরণ ঘটে। এ অবস্থাকে হেমারথ্রোসিস (Hemarthrosis) বলে। এতে অস্থিসন্ধি স্থান ফুলে যায় এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। হিমোফিলিয়ার কারণে দেহের বিভিন্ন পেশি, পরিপাকনালি, মূত্রনালি, দাঁত, নাসিকা গহ্বর ইত্যাদি থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ ঘটে থাকে। হিমোফিলিয়া রোগীর প্রায় 75%ই কোনো চিকিৎসা পায় না। প্রকৃতপক্ষে এর কোনো সহজলভ্য চিকিৎসা নেই। আমেরিকাতে জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কিছু ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

হিমোফিলিয়ার জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিনটি মানুষের X ক্রোমোসোমে থাকে এবং বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এ জিনটি হোমোজাইগাস অবস্থায় মহিলাতে এবং হেমিজাইগাস (hemigygous) অবস্থায় পুরুষে প্রকাশ পায়। রক্ত

CamScanner

তঞ্চনের স্বাভাবিক জিন X^H এবং হিমোফিলিয়ার জিন X^h হলে মানুষের রক্ত তঞ্চনের জিনোটাইপকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

১। স্বাভাবিক রক্ত তঞ্চনের পুরুষ - X^HY,
২। হিমোফিলিয়াক পুরুষ- X^hY,
৩। স্বাভাবিক রক্ত তঞ্চনের মহিলা- X^HX^H,
৪। বাহক মহিলা- X^HX^h,
৫। হিমোফিলিয়াক মহিলা- X^hX^h

হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রকাশ পায় বলে হিমোফিলিয়াক মহিলা পাওয়া যায় না বললেই চলে। কারণ একটি হোমোজাইগাস কন্যা সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে কিছু বাহক মহিলার ক্ষেত্রে রজঃস্রাবের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এদের সিমটোম্যাটিক ক্যারিয়ার (symptomatic carriers) বলে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে হিমোফিলিয়াক বংশের প্রতি দশ হাজার পুত্রের মধ্যে একটি এবং প্রতি দশ কোটি কন্যার মধ্যে একটি হিমোফিলিয়া আক্রান্ত হয়।

সমস্যা: হিমোফিলিয়াক বাবা ও স্বাভাবিক মায়ের একজন কন্যার সাথে একজন স্বাভাবিক পুরুষের বিয়ে হলে তাদের সন্তান-সন্ততি কেমন হবে?

মানুষের রক্ত জমাট বাধার স্বাভাবিক জিন X^H এবং হিমোফিলিয়ার জিন X^h। এক্ষেত্রে হিমোফিলিয়াক বাবার জিনোটাইপ- X^hY এবং স্বাভাবিক মায়ের জিনোটাইপ- X^HX^H, তাদের জন্ম দেয়া সকল কন্যাই বাহক (X^HX^h) হবে। এ বাহক কন্যার সাথে একজন সুস্থ পুরুষের (X^HY) বিয়ে হলে তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কন্যাদের অর্ধেক বাহক (X^HX^h) ও অর্ধেক স্বাভাবিক (X^HX^H) হবে এবং পুত্রদের অর্ধেক হিমোফিলিয়াক (X^hY) ও অর্ধেক স্বাভাবিক (X^HY) হবে। পাশের ছকে হিমোফিলিয়া রোগের জিনগত এ সঞ্চারণ দেখানো হলো–

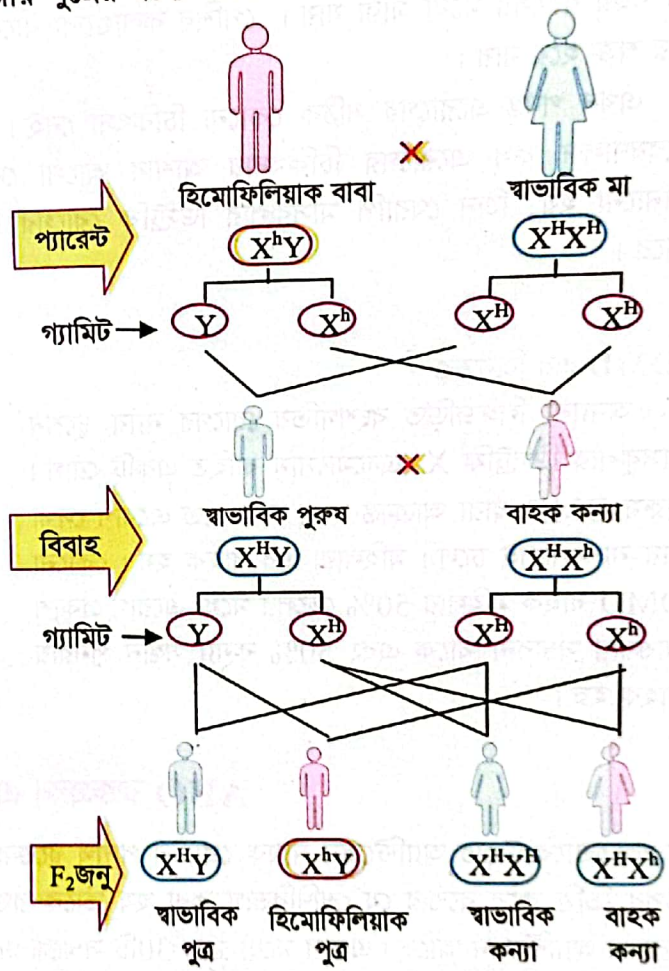

ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি (Duchenne muscular dystrophy-DMD)

ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি একটি বংশগতিয় রোগ যাতে মানবদেহের পেশিসমূহ বিশেষ পুষ্টিহীনতার কারণে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শুকিয়ে যায় এবং পরিশেষে মানুষের মৃত্যু ঘটে। ফরাসি স্নায়ুবিশেষজ্ঞ গিলাওমি বেনজামিন অ্যামান্ড ডুশেন (Guillaume Benjamin Amand Duchenne, 1806–1875) এর নামানুসারে এরোগের নামকরণ করা হয়। মানুষের X ক্রোমোসোমের Xp21 লোকাসে অবস্থিত ডিস্ট্রফিন জিনের (distrophin gene) পরিব্যক্তির ফলে DMD সৃষ্টি হয়। এ জিনের প্রকট অবস্থা পেশিকোষের গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান ডিস্ট্রফিন (dystrophin) প্রোটিন সংশ্লেষণ করে। এ প্রোটিনের অভাবে পেশি কোষের সারকোলেমা দিয়ে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম প্রবেশ করে কোষকে ধীরে ধীরে শক্ত করে ফেলে।

CamScanner

বংশগত রোগ মাস্কুলার ডিস্ট্রফির মধ্যে DMD সবচেয়ে জটিল। যুক্তরাজ্যে প্রতি 35 হাজার নবজাতকের একজ এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্তদের মাংসপেশিকে শক্তিশালি রাখার জন্য যে ডিস্ট্রফিন প্রোটিন দরকার থাকে না। ফলে মাংসপেশি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এরা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

ছয় বছর বয়সের পূর্বেই বালকের দেহে এরোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে পায়ের পেশি ও পরে উরুর পেশি শক্ত ও স্ফীত হয়। পরে এটি স্কন্দ ও দেহের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া এদের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে সমস্যা দেখা দেয়। এরোগে আক্রান্ত 10 বছর বয়সের বালক সোঁজা হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারে না। 12 বছর বয়সে হুইল চেয়ারের প্রয়োজন হয়। রোগের অগ্রগতিতে কঙ্কালতন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং বিভিন্ন অস্থি বিকৃত হয়ে যায়। মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত রোগী প্যারালাইজড হয়ে যায়। DMD আক্রান্ত মানুষ 25 বছর বয়সের মধ্যে মারা যায়। পেশির কলাগুলো ধীরে ধীরে চর্বি ও তন্তু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে শক্ত হয়ে যায়।

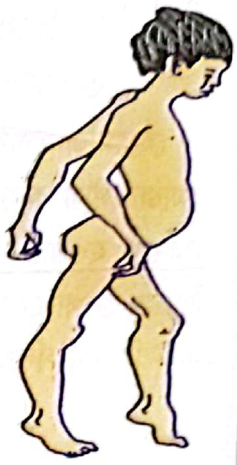

চিত্র ১১.৪
DMD আক্রান্ত বালক

এখন পর্যন্ত এরোগের সঠিক কোনো চিকিৎসা নেই। সম্প্রতি 'ল্যানসেট' জার্নালে একটি গবেষণালব্দ ফল এরোগের চিকিৎসায় আশার আলো দেখেছেন গবেষকরা। এ গবেষণায় জানানো হয়, জিন থেরাপি মাসকুলার ডিস্ট্রফি রোগের চিকিৎসায় ব্যাপক সহায়তা করতে পারে।

DMD এর জিনতত্ত্ব

অন্যান্য লিঙ্গজড়িত বংশগতিয় রোগের ন্যায় ডুশেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি X ক্রোমোসোম বাহিত একটি রোগ। পুরুষ DMD দ্বারা আক্রান্ত হয়। মহিলাতে এরোগ দেখা যায় না বললেই চলে। মহিলারা এর বাহক হয়। কোনো DMD বাহক মহিলার 50% ছেলের মধ্যে এরোগ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং 50% কন্যা সন্তান পুনরায় বাহক হয়।

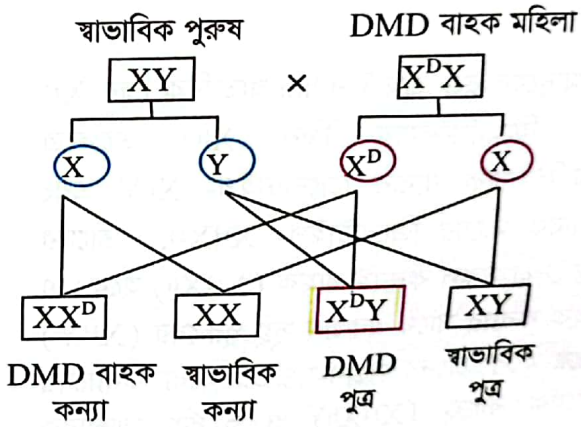

ABO রক্তগ্রুপ এবং Rh ফ্যাক্টর

বংশগতভাবে উদ্ভূত অ্যান্টিজেন নামক প্রোটিন পদার্থ রক্তের লোহিত কণিকার প্রাচীরে বিদ্যমান থাকা বা না থাকার উপর ভিত্তি করে রক্তের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তাকে রক্তগ্রুপ (blood group) বলে। মানবদেহে প্রায় 400 ধরনের অ্যান্টিজেন আছে। এদের মধ্যে মাত্র 30টি সম্মন্ধে জানা গেছে। এসব অ্যান্টিজেনের উপর ভিত্তি করে মানুষের প্রায় 21টি রক্তগ্রুপ রয়েছে। তবে রক্ত সঞ্চারণের (blood transfusion) ক্ষেত্রে সকল রক্তগ্রুপ গুরুত্ব বহন করে না। কেবল ABO ও Rh ধরনের রক্তগ্রুপ রক্ত সঞ্চারণে গুরুত্ব বহন করে। দুধরনের পদার্থ বিদ্যমান থাকার কারণে একজনের রক্ত অন্যজনের দেহে সঞ্চারণ করলে অসঙ্গতি দেখায়। এগুলো হলো-

- অ্যাগ্লুটিনোজেন (Agglutinogens): এগুলো লোহিত রক্তকণিকার আবরণীতে বিদ্যমান অ্যান্টিজেন (antigen) পদার্থ যা জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভ্রূণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে। মানুষের রক্তে প্রধান তিন ধরনের অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে, যথা- A, B ও Rh।
- অ্যাগ্লুটিনিন (Agglutinins): এগুলো রক্তের প্লাজমাতে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি (antibody)। অ্যাগ্লুটিনিন প্রাকৃতিক (IgM) ও অনাক্রম্য (IgG) ধরনের হয়ে থাকে।

দুটি বিশেষ রক্তগ্রুপে রক্ত সঞ্চারণের সময় অসঙ্গতি বিক্রিয়া ঘটে। এরা হলো- ABO ও Rh রক্তগ্রুপ। অন্যান্য রক্তগ্রুপের কয়েকটি হলো: MN রক্তগ্রুপ, কেলি রক্তগ্রুপ, ডাফি রক্তগ্রুপ, লুইস রক্তগ্রুপ ইত্যাদি।

ABO রক্তগ্রুপ

Karl Landsteiner (1868-1943) Novel Prize-1930

অস্ট্রিয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) 1901 সালে মানুষের লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা আবরণীর বাইরের দিকে সংযুক্ত অ্যান্টিজেন নামক প্রোটিনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। অ্যান্টিজেন সাধারণত দুধরনের হয়, যথা-অ্যান্টিজেন-A এবং অ্যান্টিজেন-B। কোনো একজন মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেন-A অথবা অ্যান্টিজেন-B অথবা অ্যান্টিজেন-A ও B উভয়ই উপস্থিত থাকতে পারে অথবা অ্যান্টিজেন-A ও B উভয়ই অনুপস্থিত থাকতে পারে।

মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিভাগ করেন তাকে রক্তগ্রুপ বা ABO রক্তগ্রুপ বা ল্যান্ডস্টেইনারের রক্তগ্রুপ বলে। রক্তগ্রুপ আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসেবে কার্ল ল্যান্ডস্টেইনারকে 1930 সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় যেরূপ অ্যান্টিজেন থাকে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রক্তরস বা প্লাজমায় অ্যান্টিবডি নামক বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকে। মানুষের প্লাজমায় দুধরনের অ্যান্টিবডি থাকে যথা,- অ্যান্টিবডি-A বা anti-A বা α এবং অ্যান্টিবডি-B বা anti-B বা β। প্রতিটি অ্যান্টিবডি তার সমগোত্রীয় অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে রক্তকে জমাট বাঁধায় অর্থাৎ অ্যান্টিবডি-A, অ্যান্টিজেন-A এর সাথে এবং অ্যান্টিবডি-B, অ্যান্টিজেন-B এর সাথে বিরূপ বিক্রিয়া ঘটায়।

ABO রক্তগ্রুপ পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষকে চারটি রক্তগ্রুপে বিভক্ত করা হয়, যথা- (১) A রক্তগ্রুপ, (২) B রক্তগ্রুপ, (৩) AB রক্তগ্রুপ ও (৪) O রক্তগ্রুপ । নিম্নের ছকে এদের বিবরণ দেয়া হলো-

১। রক্তগ্রুপ A: এদের RBC তে অ্যান্টিজেন-A এবং প্লাজমায় অ্যান্টিবডি- β বা B থাকে।

২। রক্তগ্রুপ B: এদের RBC তে অ্যান্টিজেন-B এবং প্লাজমায় অ্যান্টিবডি- α বা A থাকে।

৩। রক্তগ্রুপ AB: এদের RBC তে অ্যান্টিজেন A ও B উভয়ই থাকে কিন্তু প্লাজমায় কোনো অ্যান্টিবডি থাকে না।

৪। রক্তগ্রুপ O: এদের RBC তে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না কিন্তু প্লাজমায় অ্যান্টিবডি α ও β উভয়ই থাকে।

[O *এসেছে জার্মান শব্দ ohne যার অর্থ শূন্য (without)*]

অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষের চার ধরনের রক্তগ্রুপ-

	রক্তগ্রুপ A	রক্তগ্রুপ B	রক্তগ্রুপ AB	রক্তগ্রুপ O
RBC	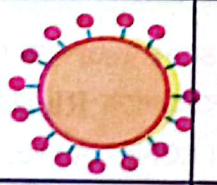	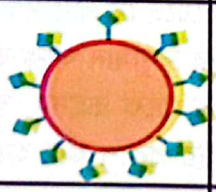	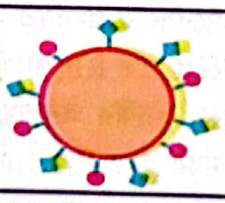	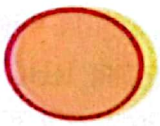
প্লাজমায় অ্যান্টিবডি	অ্যান্টিবডি β	অ্যান্টিবডি α	কোনো অ্যান্টিবডি নেই	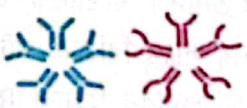 অ্যান্টিবডি α ও β
RBC তে অ্যান্টিজেন	A অ্যান্টিজেন	B অ্যান্টিজেন	A ও B অ্যান্টিজেন	কোনো অ্যান্টিজেন নেই

CamScanner

ABO রক্তগ্রুপের জিনতত্ত্ব

বার্নস্টেইন (Bernstein, 1925) প্রমাণ করেন যে মানুষের রক্তগ্রুপ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একই লোকাসে অবস্থিত তিনটি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্রোমোসোমে জিনের এরূপ অবস্থাকে মালটিপল অ্যালিল (multiple allele) বলে। রক্তের গ্রুপ নিয়ন্ত্রণকারী জিনকে রক্তগ্রুপ আবিষ্কারক ল্যান্ডস্টেইনার-এর নামানুসারে L দ্বারা প্রকাশ করা হয়। L জিনের তিনটি অ্যালিল আছে। এরা হলো- L^A, L^B ও L^O। এদের মধ্যে L^A এবং L^B অ্যালিল রক্তের লোহিত কণিকায় যথাক্রমে অ্যান্টিজেন-A এবং অ্যান্টিজেন-B সৃষ্টির জন্য দায়ী। L^O কোনো অ্যান্টিজেন সৃষ্টি করে না। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে L^A এবং L^B অ্যালিল L^O অ্যালিল-এর উপর প্রকট। আবার L^A এবং L^B অ্যালিল পরস্পর সহপ্রকটতা (codominance) প্রদর্শন করে, অর্থাৎ এদের অ্যালিল সিরিজের প্রকটতাক্রম (codominance hierarchy) হলো: $L^A = L^B > L^O$.

নিম্নলিখিত উপায়ে এরা চার ধরনের রক্তগ্রুপ সৃষ্টি করে-

জিনোটাইপ		রক্তগ্রুপ
বিশুদ্ধ	সংকর	
$L^A L^A$	$L^A L^O$	A
$L^B L^B$	$L^B L^O$	B
-	$L^A L^B$	AB
$L^O L^O$	-	O

একটি সংকর A (AO) গ্রুপধারী মা ও সংকর B (BO) গ্রুপধারী বাবার সন্তানদের সম্ভাব্য রক্তগ্রুপ নিম্নরূপ:

মায়ের জননকোষ	বাবার জননকোষ		সন্তানদের রক্তগ্রুপ অনুপাত- A : B : AB : O = 1:1:1:1
	B	O	
	সন্তানের জিনোটাইপ		
A	AB	AO	
O	BO	OO	

Rh রক্তগ্রুপ (Rh blood group)

কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) এবং এ এম উইনার (A. M. Wiener) 1940 সালে রেসাস বানর *Macaca mulatta*-এর লোহিত রক্তকণিকায় এক ধরনের অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন। এ অ্যান্টিজেনকে রেসাস অ্যান্টিজেন বা রেসাস ফ্যাক্টর বা Rh ফ্যাক্টর বলে। পরবর্তীতে এ দুজন বিজ্ঞানী মানুষের লোহিত রক্তকণিকায়ও এদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্রায় 85% মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় Rh ফ্যাক্টর বিদ্যমান থাকে। যেসব মানুষের RBC-তে Rh ফ্যাক্টর বিদ্যমান থাকে তাদের রক্তগ্রুপকে **Rh** পজেটিভ বা **Rh+ve** এবং যেসব মানুষের RBC-তে Rh ফ্যাক্টর অনুপস্থিত থাকে তাদের রক্তগ্রুপকে **Rh** নেগেটিভ বা **Rh-ve** বলা হয়। অন্যান্য রক্তগ্রুপের সাথে সমন্বয় করে Rh ফ্যাক্টর প্রকাশ করা হয়। যেমন- A+ve, A-ve, B+ve, O+ve, AB-ve ইত্যাদি। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্তরস বা প্লাজমায় কোনো Rh-অ্যান্টিবডি থাকে না যা Rh-অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটাতে পারে। কিন্তু Rh নেগেটিভ (Rh-ve) মানুষের দেহে Rh পজেটিভ (Rh+ve) মানুষের রক্ত সঞ্চারণ ঘটালে Rh-অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে Rh-অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে রক্তের লোহিতকণিকা ধ্বংস করে দেয়। AB+ve গ্রুপধারী মানুষকে সর্বজন গ্রহীতা **(universal recipients)** বলে কারণ তারা যে কোনো গ্রুপের রক্ত নিতে পারে। অন্যদিকে O-ve গ্রুপধারী মানুষকে সর্বজন দাতা **(universal donar)** বলে কারণ তারা যে কোনো গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে।

CamScanner

রক্ত সঞ্চারণের পূর্বে অবশ্যই রক্তগ্রুপ নির্ণয় করে ক্রস ম্যাচিং (cross-matching) করে নিতে হয়। তা না হলে বিভিন্ন উপসর্গ সহ রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিম্নের ছকে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের রক্তগ্রুপ এবং রক্তদান ও রক্তগ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণ দেয়া হলো-

রক্তগ্রুপ	RBC এর Rh অ্যান্টিজেন	যে গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে
A+	বিদ্যমান	A+, AB+	A+, A-, O+, O-
B+	বিদ্যমান	B+, AB+	B+, B-, O+, O-
AB+	বিদ্যমান	AB+	সকল গ্রুপ থেকে রক্ত নিতে পারে
O+	বিদ্যমান	A+, B+, AB+, O+	O+, O-
A-	অনুপস্থিত	A-, AB-, A+, AB+	A-, O-,
B-	অনুপস্থিত	B-, AB-, B+, AB+	B-, O-
AB-	অনুপস্থিত	AB+, AB-	AB-, O-
O-	অনুপস্থিত	সকল গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে	O-

Rh-ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা

১। রক্ত সঞ্চারণের ক্ষেত্রে: Rh নেগেটিভ (Rh-ve) রক্তগ্রুপ বিশিষ্ট কোনো রোগীর দেহে Rh পজেটিভ (Rh+ve) গ্রুপের রক্তের সঞ্চারণ ঘটালে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর রক্তের প্লাজমায় Rh-অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়। ঐ রোগী যদি পরবর্তীতে কখনও Rh+ve গ্রুপের রক্ত গ্রহণ করে তাহলে Rh-অ্যান্টিবডির প্রভাবে গৃহীত রক্তের লোহিত কণিকাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এতে বিভিন্ন অসুবিধাসহ রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

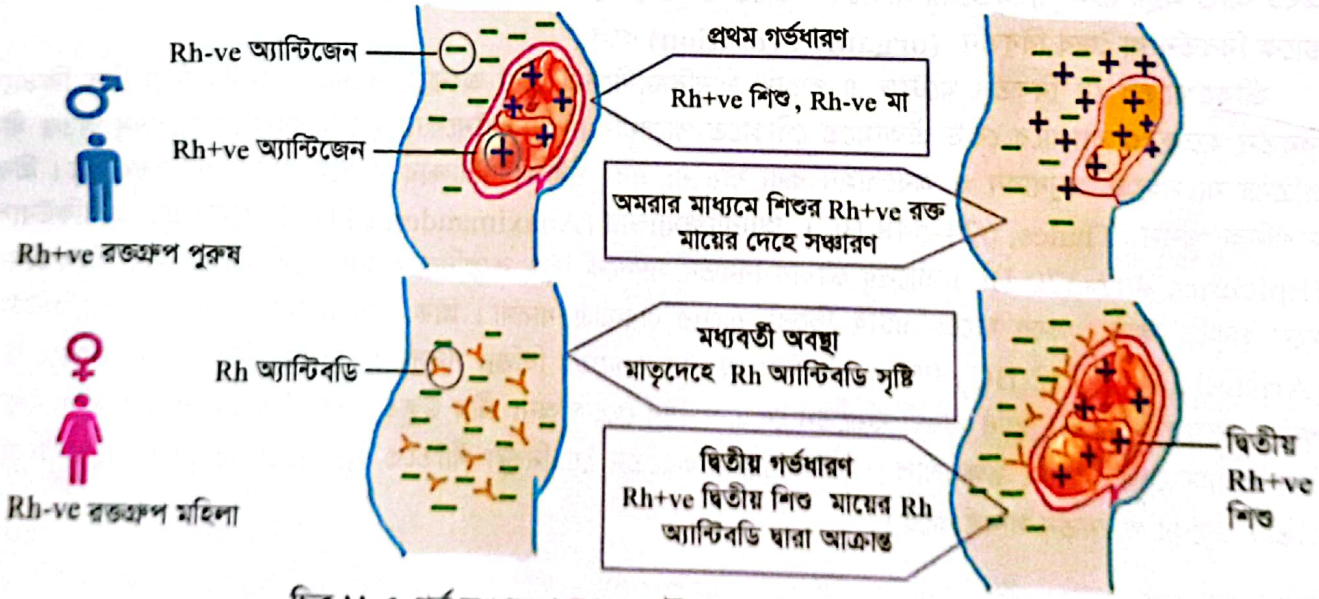

চিত্র ১১.৫ গর্ভ সঞ্চারণে Rh-ফ্যাক্টরের এর গুরুত্ব

২। গর্ভ সঞ্চারণের ক্ষেত্রে: Rh নেগেটিভ (Rh-ve) রক্তগ্রুপ বিশিষ্ট মহিলার সাথে Rh পজেটিভ (Rh+ve) রক্তগ্রুপের কোনো পুরুষের বিয়ে হলে তাদের সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। বংশগতভাবে Rh পজেটিভ (Rh+ve) অবস্থা Rh নেগেটিভ (Rh-ve) অবস্থার উপর প্রকট হওয়ায় এ দম্পতির প্রথম

CamScanner

সন্তান Rh পজেটিভ (Rh+ve) হবে। এ শিশু মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে মায়ের রক্তে Rh-অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হবে। প্রথমবার গর্ভধারণকালে Rh-অ্যান্টিবডি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত না হওয়ায় শিশুর কোনো ক্ষতি হয় না এবং এ শিশু জীবিত থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় বা পরবর্তী সময়ে Rh+ve সন্তান ধারণকালে পূর্বে উৎপাদিত মায়ের রক্তের Rh-অ্যান্টিবডি অমরার মাধ্যমে ভ্রূণে প্রবেশ করে এবং ভ্রূণের লোহিত রক্তকণিকাগুলো ধ্বংস করতে থাকে। একে মেডিকেল টার্মে **Rh incompatibility** বলে। এতে ভ্রূণের বা সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। এ অবস্থাকে হিমোলাইটিক ডিজিস অব নিউবর্ন (HDN) বা এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (Erythroblastosis fetalis) বলে।

১১.৮ বিবর্তন (Evolution)

বিজ্ঞানীদের ধারণা বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান যে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীববৈচিত্র্য দেখা যায় তা তাদের বর্তমান রূপ নিয়ে এক দিনেই পৃথিবীতে আসেনি। এক প্রজাতি থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে অন্য প্রজাতির। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য বেঁচে থাকার তাগিদেই এসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আর প্রজাতি গঠনে জীবজগতের যে কোনো ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বলে। বিবর্তনের ইংরেজি পরিভাষিক শব্দ হচ্ছে evolution যা ল্যাটিন শব্দ, *e*=from; *volvere*=to roll থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো পাক খুলে যাওয়া বা বিকশিত হওয়া (unrolling)। ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) সর্বপ্রথম evolution শব্দটি ব্যবহার করেন।

বিবর্তন একটি দীর্ঘ ও ধারাবাহিক জটিল প্রক্রিয়া। জীবজগতে হাজার হাজার বছর ধরে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তনের বিকাশ ঘটেছে। প্রথম সৃষ্ট জীব হতে বিবর্তনের জটিল পথ ধরে অগ্রসর হয়েই বর্তমান পৃথিবীর সব উদ্ভিদ ও প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে, এটাই বিবর্তনের মূল কথা।

জীববিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে বিবর্তনের সংজ্ঞা দিয়ে দিয়েছেন। চার্লস ডারউইন (Charles Darwin) বিবর্তনকে **'পরিবর্তনসহ উদ্ভাবন'** (decent with modification) বলেছেন। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী **'প্রকৃতিতে যে ধারাবাহিক অথচ অতি মন্থর ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে অতীতে উদ্ভূত কোনো সরল জীব হতে জটিলতর ও উন্নত জীবের উদ্ভব হয় তাকে বিবর্তন বা জৈব বিবর্তন (organic evolution) বলে।'**

জীবজগতের যে বিবর্তন ঘটেছে এ প্রত্যয় জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে জন্মেছে অনেক আগেই। কিন্তু ঠিক কিভাবে বিবর্তন হচ্ছে এ ব্যাপারে কেউ ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেননি। এ মতানৈক্যের মূল কারণ হলো বিবর্তন অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া যা সহজে অনুধাবন ও অবলোহন করা যায় না এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। গ্রিক দার্শনিক থেলস (Thales, 624-548 BC), অ্যানাক্সিম্যান্ডার (Anaximander, 611-547 BC) এবং এপিকিউরাস (Epicurus, 441-370 BC) তাঁদের লেখায় বিবর্তন সম্পর্কে কিছু কাল্পনিক ধারণা রেখে গেছেন। সব পরিবর্তনের মূলে প্রকৃতি কাজ করে যাচ্ছে এটাই ছিলো তাঁদের একমাত্র ধারণা। গ্রিক জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle, 384-322 BC) লক্ষ করেছিলেন যে, জীবজগতের বিভিন্ন সদস্যকে সুষ্ঠুভাবে নিচ থেকে ক্রমান্বয়ে উঁচু পর্যায়ে সাজানো সম্ভব। তিনি ধারণা করতেন যে এক জীব থেকে অন্য জীব উদ্ভূত। তবে বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ছিল অন্যান্যদের মতোই রক্ষণশীল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নির্ভুল নীতিতে (perfecting priciples) প্রকৃতি প্রতিটি জীবের পরিবর্তন সাধন করে।

বিবর্তনের ধাপ

বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে বিবর্তনের তিনটি ধাপ নির্ণয় করেছেন, যথা-

১। মাইক্রো বিবর্তন (Microevolutiom): জীবের জিন মিউটেশনের প্রভাবে যে বিবর্তন ঘটে তাকে মাইক্রো বিবর্তন বলে। এক্ষেত্রে কোনো প্রজাতির জীবগোষ্ঠীতে অল্পমাত্রায় পরিবর্তন সাধিত হয়ে বিভিন্ন জাত (race), ক্লাইন (cline) বা উপ-প্রজাতির (sub species) সৃষ্টি হয়।

CamScanner

২। ম্যাক্রো বিবর্তন (Macroevolution): মাইক্রো বিবর্তন উপ প্রজাতির ধাপ অতিক্রম করে প্রজাতি সৃষ্টির বিবর্তনকে ম্যাক্রো-বিবর্তন বলে।

৩। মেগা বিবর্তন (Megaevolution): ম্যাক্রো বিবর্তন ধাপ অতিক্রম করে গণ এর উপরের পর্যায়ের স্তরগুলো সৃষ্টি হলে তাকে মেগা বিবর্তন বলে। এ বিবর্তনের মাধ্যমে মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে পাখি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

বিবর্তনের ধরন

জীবের আবাসস্থলের বৈচিত্র্য এবং অভিযোজনিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে বিবর্তন তিন ধরনের হয়ে থাকে, যথা-

১। অপসারী বিবর্তন (Divergent evolution): নিকট সম্পর্কযুক্ত জীবগোষ্ঠী ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজিত হয়ে যে বিবর্তন ঘটায় এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে তাকে অপসারী বিবর্তন বলে।

২। অভিসারী বিবর্তন (Convergent evolution): দূর সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠী একই পরিবেশের মধ্যে বাস করার ফলে অভিযোজনের কারণে তাদের দেহে সাদৃশ্যগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মাধ্যমে যে বিবর্তন ঘটে তাকে অভিসারী বিবর্তন বলে।

৩। সমান্তরাল বিবর্তন (Parallel evolution): দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর দুটি দূরবর্তী কিন্তু একই পরিবেশে বসবাস ও অভিযোজনের মাধ্যমে যখন একইভাবে বিবর্তিত হয় তখন তাকে সমান্তরাল বিবর্তন বলে।

বিবর্তনের মতবাদ

আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিবর্তন সম্পকে যাঁরা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে রবার্ট হুক (Robert Hook, 1635-1703), জন রে (John Ray, 1627-1705), বাফন (Buffon, 1707-1788), ল্যামার্ক (Lamarck, 1744-1829), ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882) এবং দ্যা ভ্রিসের (Hugo de Vries) নাম উল্লেখযোগ্য। বিবর্তন সম্পর্কিত যেসব আধুনিক মতবাদ রয়েছে সেগুলো হলো:

১। ল্যামার্কের 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশাণুক্রম' মতবাদ বা ল্যামার্কিজম (Theory of acquired characters)
২। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' মতবাদ বা ডারউইনিজম (Theory of natural selection)
৩। আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ বা 'নিওডারউইনিজম' (Modern synthesis theory or Neodarwinism)
৪। ভাইজম্যানের 'জার্মপ্লাজম' মতবাদ (Germplasm theory of Weismann) এবং
৫। ভ্রিসের 'পরিব্যক্তি' মতবাদ (Mutation theory of de Vries)।

নিম্নে ল্যামার্ক ও ডারউইনের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১। ল্যামার্কের মতবাদ বা ল্যামার্কিজম (Lamarckism)

বিবর্তনের বিষয়ে সর্বপ্রথম একটি যুক্তিযুক্ত মতবাদ তুলে ধরেন জ্যাঁ বাপটিস্ট ল্যামার্ক (Jean Baptiste Lamarck, 1744-1829) নামক একজন ফরাসি বিজ্ঞানী। এ মতবাদটি "**Theory of inheritance of acquired characters**" বা 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশাণুক্রম' নামে খ্যাত। তাঁর লেখা ফিলোসফিকা জুওলজিক (Philosophica Zoologique) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 1809 সালে এ মতবাদ প্রকাশিত হয়।

জ্যাঁ বাপটিস্ট ল্যামার্ক (1744-1829)

সমসাময়িক অন্যান্য জীববিজ্ঞানীদের মতো ল্যামার্কও বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি জীবের একটি অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি থাকে। আর এ শক্তিই পরিবেশের সব প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিহত করে জীবের বিভিন্ন অঙ্গের বিকাশ ও কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ল্যামার্কের মতবাদ মূলত এ প্রত্যয়কে ভিত্তি করেই। ল্যামার্কের মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সূত্র চারটি। এগুলো হলো:

সূত্র-১: জীবনধারণের প্রয়োজনে পরিবেশ প্রতিটি প্রাণীর গঠন, আকৃতি ও সংগঠনকে প্রভাবিত করে।

CamScanner

সূত্র-২: কোনো অঙ্গের পুনঃপুনঃ ব্যবহার বা প্রতিনিয়ত ব্যবহার সে অঙ্গকে সুগঠিত করে এবং তার বৃদ্ধি ঘটায়। আবার কোনো অঙ্গ ব্যবহৃত না হলে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তার ক্ষয়প্রাপ্তি বা বিলুপ্তি ঘটে।

সূত্র-৩: পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রাণীর দেহে নতুন অঙ্গের উদ্ভাবন হয়। এ নতুন অঙ্গের আকার ও বিকাশ তার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল।

সূত্র-৪: ব্যবহার ও অব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ কর্তৃক আনীত সব পরিবর্তন প্রাণীর দেহে সংরক্ষিত হয় এবং প্রজননের মাধ্যমে তা পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত হয়।

ল্যামার্ক তাঁর মতবাদে আঙ্গিক বিবর্তনের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, পরিবর্তনসমূহ যদি কয়েক জনন (generation) বা বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে তা হলে তার ফলে যে প্রাণীর উদ্ভব হবে সেটি আকৃতি, প্রকৃতি এবং কার্যাদির দিক থেকে পূর্বপুরুষের চেয়ে কিছুটা ভিন্নতর হবে ।

ল্যামার্কের মতবাদের ব্যাখ্যা

❑ ল্যামার্ক তাঁর মতবাদের সমর্থন যোগাতে জিরাফের লম্বা গলার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধারণায় জিরাফের পূর্বপুরুষের গলা লম্বা ছিলো না। বিবর্তনের মাধ্যমে খাটো গ্রীবা (গলা) বিশিষ্ট পূর্বপুরুষ থেকেই বর্তমানের লম্বা গ্রীবার জিরাফের আবির্ভাব হয়েছে।

ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ল্যামার্ক বলেছেন যে খাটো গ্রীবা বিশিষ্ট জিরাফ ঘাসের পরিবর্তে উঁচু গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতে শুরু করে এবং পাতা নাগাল পাওয়ার জন্য তারা অনবরত ঘাড় লম্বা এবং উঁচু করার প্রচেষ্টা চালায়। বংশ পরম্পরায় এ প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত তাদের ঘাড় ও গলা লম্বা হয়ে যায় এবং বর্তমান রূপ ধারণ করে।

❑ ব্যবহারের চাহিদায় যে নতুন অঙ্গের সংযোজন হতে পারে তার উদাহরণস্বরূপ ল্যামার্ক জলজ পাখির প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর ধারণায় একসময় সব পাখিই ছিল স্থলচর। কিন্তু কিছুসংখ্যক পাখি খাদ্যের অন্বেষণে জলাশয়ের কাছে যায় এবং পানির ভেতর থেকে খাদ্য আহরণের জন্য তাদের পায়ের ব্যবহার শুরু করে। এছাড়া পানিতে চলাচলের জন্যও তারা পায়ের ব্যবহার চালায়। ফলে পায়ের আঙ্গুলের পাশ দিয়ে চামড়ার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। এভাবে দীর্ঘ দিনের ব্যবহাওে পাখির লিপ্ত-পদের (web-toed foot) উদ্ভব হয় যা বর্তমানে হাঁস, পেলিক্যান ইত্যাদি পাখিতে দেখা যায়।

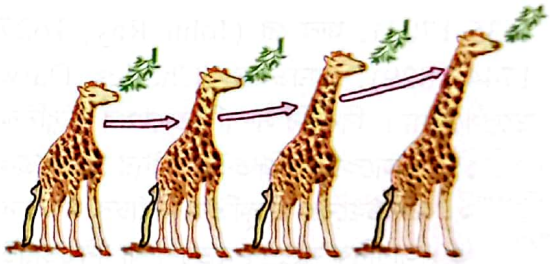

চিত্র ১১.৬ ল্যামার্কের মতবাদ অনুযায়ী জিরাফের গ্রীবার বিবর্তন

❑ অব্যবহারের ফলে অঙ্গের যে বিলুপ্তি ঘটে ল্যামার্ক তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সাপের আঙ্গিক গঠনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। ঘাসের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলার সময় সাপ তার শরীরকে অহরহ প্রসারিত করে এবং এক্ষেত্রে পায়ের ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন হয় না বরং সরু জায়গা দিয়ে চলাচল করার সময় পা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ল্যামার্কের ধারণা অনুযায়ী সাপের পূর্বপুরুষেরা চলাচলের সময় পায়ের ব্যবহার ধীরে ধীরে বর্জন করে। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকায় অব্যবহারের ফলে একসময় সময় তাদের দেহ থেকে পা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ল্যামার্কের মতবাদের বিপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ

১। **অগাস্ট ভাইজম্যান** (August Weismann, 1834-1914) নামক একজন জার্মান বিজ্ঞানী 22 জেনারেশন ধরে ইঁদুরের লেজ কেটে পরীক্ষা করে দেখেন নতুন প্রজন্মে কোনো লেজবিহীন ইঁদুর জন্মায়নি।

২। কুস্তিগীরের শক্তিশালি পেশি তার সন্তানের দেহে বিকশিত হয় না।

৩। ভারতীয় মহিলারা কান ও নাকে ছিদ্র করে অলঙ্কারাদি পরার জন্য। এ বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশের সন্তানদের কান ও নাকে সঞ্চারিত হয় না।

৪। মুসলমান ও ইহুদী বালকদের লিঙ্গের অগ্রভাগের পিপিউস নামক চামড়া কেটে ফেলা হয়, কিন্তু এটি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না।

CamScanner

৫। অনেক নোবেল বিজয়ীর সন্তান ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয় যা ল্যামার্কের মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

ল্যামার্কের মতবাদ ল্যামার্কিজম (Lamarkism) নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। নিঃসন্দেহে এ মতবাদ বিভিন্ন পরিবেশে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীর চমৎকার অভিযোজনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। তবে এ মতবাদের সপক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির যথেষ্ট অভাব থাকায় বর্তমানকালে এর সমর্থক খুবই কম। মেন্ডেলের বংশগতিয় সূত্র এবং ভাইজম্যানের জার্মপ্লাজম মতবাদ ল্যামার্কের মতবাদকে সমর্থন করে না। তাছাড়া জিনতাত্ত্বিক পরীক্ষ-নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অর্জিত বৈশিষ্ট্য কখনো বংশগত হয় না।

২। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা ডারউইনিজম (Darwinism)

রবার্ট চার্লস ডারউইন (Robert Charles Darwin) 1809 সালে 12 জানুয়ারি ইংল্যান্ডের শ্রুসবেরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিগল (H.M.S Beagle) নামের জাহাজে চড়ে প্রায় 5 বছর ধরে আটলান্টিক মহাসাগরের কতগুলো দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষ করে গ্যালাপ্যাগোজ দ্বীপপুঞ্জে (Galapagos Island) পরিভ্রমণ করেন এবং জরিপ কাজ চালান (1831-1836)। এ সমুদ্র যাত্রায় ডারউইন যেসব এলাকা পরিদর্শন করেন সেসব এলাকা থেকে অসংখ্য ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার মূল্যবান তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে আসেন। সংগৃহীত এসব নমুনা ও তথ্যকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে তিনি কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করেন। 1882 সালের 19 এপ্রিল 71 বছর বয়সে এ প্রকৃতিবিজ্ঞানী মারা যান। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে (Westminster abbey) নিউটনের কবরের নিকটে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ল্যামার্কের পর বিবর্তন সম্পর্কিত সুচিন্তিত এবং জোড়ালো মতবাদ প্রকাশ করেন চার্লস ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882)। তাঁর মতবাদটি প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ (Theory of Natural Selection) নামে পরিচিত এবং বিখ্যাত গ্রন্থ ***On the Origin of Species by Means of Natural Selection*** এ 1859 সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর এ মতবাদকে ডারউইনিজম (Darwinism) নামে অভিহিত করা হয়।

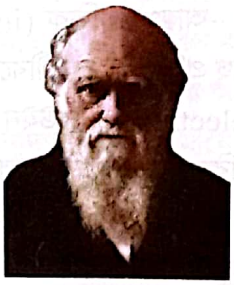

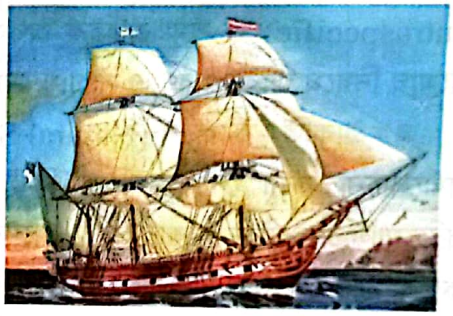

চিত্র ১১.৭ ডারউইন এবং বিগল জাহাজ

ডারউইন তাঁর মতবাদের দ্বারা বিবর্তনের কলাকৌশল ও প্রবাহকে তথ্যবহুল বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ প্রবর্তনের কৃতিত্ব অবশ্য ডারউইনের একার নয়। তাঁর সমসাময়িক প্রকৃতি বিজ্ঞানী অস্ট্রেলিয়ার আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (Alfred Russel Wallace) স্বতন্ত্রভাবে প্রায় একই সময়ে অনুরূপ মতবাদ উপস্থাপন করেন। এজন্য এ মতবাদটি ডারউইন-ওয়ালেসের প্রাকৃতিক মতবাদ নামেও পরিচিত।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ নিম্নলিখিত পাঁচটি তথ্য ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত:

১। প্রকরণ (Variation): প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিটি জীব প্রজাতির মধ্যেই চেহারা, আকৃতি বা জীবন ব্যবস্থায় কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। জীবের এসব অমিল বা বৈসাদৃশ্যতাকে প্রকরণ বা Variation বলে। একই প্রজাতির দুটি সদস্য, এমনকি অভিন্ন যমজ (identical twins) ব্যতিরিকে একই পিতামাতার দুটি সন্তানও কখনো হুবহু একরকম হয় না। বিভিন্ন জীবে এসব প্রকরণ বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পেতে পারে। ডারউইন জীবজগতের এ প্রকরণকে বিবর্তনে বা নতুন প্রজাতি গঠনের (speciation) চাবিকাঠি হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, পরিবেশে দৃষ্ট অনেক প্রকরণই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বেঁচে থাকার জন্য একটি প্রজাতির পক্ষে তারা সহায়কও হয় না আবার অসুবিধাও সৃষ্টি করে না। আবার কিছু কিছু প্রকরণ বেঁচে থাকার ব্যাপারে তাদের বাহকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অনেকসময় এসব প্রকরণ বেশ স্পষ্ট এবং একটি প্রজাতির কিছু সদস্যের মধ্যে বিশেষ ধারায় বা বিন্যাসে

CamScanner

প্রকাশিত হয়। প্রজাতির এ ধরনের অংশ বিশেষকে ডারউইন প্রারম্ভিক প্রজাতি (incipient species) বা গঠনোন্মুখ প্রজাতি বলে উল্লেখ করেন।

২। গুণোত্তর হারে সংখ্যা বৃদ্ধি (Geometric ratio of increase): জীবজগতে প্রতিটি প্রজাতির গুণোত্তর হারে সংখ্যা বাড়াবার একটি প্রবণতা আছে। তাই প্রতিটি জীব যে পরিমাণে বেঁচে থাকতে পারে তার তুলনায় অনেক বেশি সন্তান-সন্ততি জন্ম দেয়। অনেক প্রাণী রয়েছে যাদের প্রজনন ক্ষমতা অনেক বেশি। উপযুক্ত পরিবেশে এরা অল্প সময়েই এমন অবিশ্বাস্য হারে সংখ্যায় বাড়তে পারে যে সবাই বেঁচে থাকলে পৃথিবীতে তাদের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব হতো না। উদাহরণস্বরূপ এককোষী প্রাণী প্যারামেসিয়াম (*Paramecium*) বছরে 600 বার প্রজনন ঘটায়। এ প্রাণীর সব বংশধর বেঁচে থাকলে এক বছরেই পৃথিবী ভরে যেতো। জীবের সংখ্যা বৃদ্ধির এ ধরণের প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক পরিবেশে প্রায় সব প্রজাতির সদস্য সংখ্যাই মোটামোটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। কারণ প্রতিটি জননের অধিকাংশ সন্তান-সন্ততিই বিভিন্ন কারণে মারা যায়।

৩। বাঁচার সংগ্রাম (Struggle for existance): ডারউইনের মতে যেহেতু প্রতিটি জীব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি পরিমাণ সন্তান-সন্ততির জন্ম দেয় সেহেতু বেঁচে থাকার জন্য তাদের মধ্যে সংগ্রাম অবধারিত। এ সংগ্রাম ঘটে মূলত খাদ্য, বাসস্থান ও প্রজনন স্থানকে কেন্দ্র করে। প্রতিটি জীবকে এ তিনটি মৌলিক উপাদান লাভের জন্য প্রতিনিয়ত বহুমূখী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এ সংগ্রাম বিভিন্ন রকম হতে পারে যেমন, প্রাণীতে প্রাণীতে সংগ্রাম, উদ্ভিদে উদ্ভিদে সংগ্রাম, উদ্ভিদে-প্রাণীতে সংগ্রাম এবং উদ্ভিদ-প্রাণী ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে সংগ্রাম। এ সংগ্রাম অন্তঃপ্রজাতিক (intraspecific) বা সমপ্রজাতিক অথবা আন্তঃপ্রজাতিক (interspecific) বা বিসমপ্রজাতিক হতে পারে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জীবণ-মরণ এ সংগ্রাম চলছে প্রতি নিয়ত, জীবনের প্রতি স্তরে এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

৪। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection): ডারউইন জীবজগতের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সংগ্রামকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে কিছু কিছু প্রাণীর অনুকূল প্রকরণ (favourable variation) পরিবেশের এ প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকার জন্য তাদের সহায়ক হয়। অন্যদিকে যারা এ ধরনের প্রকরণ লাভ করেনি তারা প্রকৃতি কর্তৃক মনোনীত হয় না। ফলে তাদের বিলুপ্তি ঘটে অথবা প্রজনন ঘটাতে ব্যর্থ হয়।

ঘন চারা গাছের মধ্যে যেসব গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে স্বভাবতই তারা অন্যদের ছায়ায় ফেলে নিজেরা সাফল্যভাবে জন্মায়। অন্যগুলো আলোর অভাবে টিকতে ব্যর্থ হয় এবং মারা যায়। প্রজনন এলাকা নিয়ে লড়াইয়ে রপ্ত পাখির মধ্যেও যেটি আকারে বড় ও শক্তি সামর্থ্যে উন্নত, অন্যদের পরাজিত করে সেটি জয়লাভ করে। এভাবে জীবন সংগ্রামে যারা বাঁচে ডারউইনের মতে তারাই 'প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়' এবং তারাই বংশবিস্তারে সুযোগ পায়। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert spencer) এ প্রক্রিয়ায় টিকে থাকাকে 'যোগ্যতমের উর্দ্ধতন' (survival of the fitest) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫। নতুন প্রজাতির সৃষ্টি (Origin of new species): ডারউইনের মতে জীবনধারণ সংগ্রামে কেবল সেসব জীব সাফল্য লাভ করে যেসব জীবদেহে সংগ্রামের জন্য অনুকূল ও সহায়ক প্রকরণ থাকে। এসব প্রকরণ প্রজননের মাধ্যমে পরবর্তী বংশে সঞ্চারিত ও সংরক্ষিত হয়। কয়েক প্রজন্ম (generation) ধরে এটি চললে আরো সুষ্ঠুভাবে পরিবেশে অভিযোজিত হয়। পরিবেশের অবস্থার আবার কোনো পরিবর্তন ঘটলে যেসব প্রাণী সে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের মধ্যে অনুকূল প্রকরণ ঘটাতে পারে কেবল তারাই টিকে থাকে। যারা পারে না তারা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়। যেসব প্রজাতি অতীতে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে গেছে, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের ব্যর্থতা এজন্য দায়ী। ডারউইন তাই যুক্তি দেখান যে, দীর্ঘদিন ধরে প্রকরণের ক্রমাগত সঞ্চয় একটি জীবের বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটায়। আর এর ফলেই উদ্ভব হয় নতুন প্রজাতির।

CamScanner

ডারউইনিজম ও ল্যামার্কিজমের মধ্যে তুলনা

বিষয়	ল্যামার্কিজম	ডারউইনিজম
১। মতবাদের নাম	অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশাণুক্রম মতবাদ বা Inheritance of Acquired Character Theory নামে পরিচিত।	এটি প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বা Natural Selection Theory নামে পরিচিত।
২। প্রকাশকাল	1809 সাল।	1859 সাল।
৩। যে গ্রন্থে প্রকাশিত	Philosophie Zoologique.	On the origin of species by means of natrural selection.
৪। মতবাদের ধরণ	এটি একটি যান্ত্রিক মতবাদ।	এটি একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ।
৫। মূল প্রতিপাদ্য	ক্রমাগত পরিবর্তনের ধারা, প্রয়োজনে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি, ব্যবহারের ফলে অঙ্গের বৃদ্ধি বা অব্যবহারের ফলে অঙ্গের বিলুপ্তি, অর্জিত গুণের বংশানুক্রম ইত্যাদি।	প্রকরণ, গুণোত্তর হারে সংখ্যাবৃদ্ধি, জীবন সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, নতুন প্রজাতি সৃষ্টি ইত্যাদি।
৬। দৈহিক বিবর্তন	পরিবেশের পরিবর্তনের কারণে জীবদের সক্রিয় প্রচেষ্ঠার ফলে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে।	জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় নানা কারণে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে।
৭। জীবের বেঁচে থাকা	প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে প্রতিটি জীব বেঁচে থাকে।	কেবল জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া জীব বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়।
৮। গ্রহণযোগ্যতা	বর্তমানে এটি বিজ্ঞানী মহলে অনাদৃত ও পরিত্যক্ত।	বর্তমানে এটি বিজ্ঞানী মহলে সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য।

নিউডারউইনিজম (Neodarwinism)

সিওয়াল রাইট (Sewall Wright), ডবজানস্কি (T. Dobzhansky), স্টাবিনস (G.L. Stabbins), জুলিয়ান হাক্সলি (Julian Huxleey), থমাস মরগান (Thomas Hunt Morgan), আর্নেস্ট মায়ার (Ernst Mayr), সিমসন (George Gaylord Simpson) প্রমূখ বিজ্ঞানী ডাইউইনের মতবাদকে আধুনিক জ্ঞান ও তথ্যের আলোকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এসব বিজ্ঞানী ডারউইনের মতবাদের মূল বিষয়গুলোকে অপরিবর্তিত রেখে জিনতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, বংশগতিবিদ্যা এবং আধুনিক জীববিজ্ঞানের কয়েকটি শাখাকে সমন্বয় করে যে ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন তাকে নিউডারউইনিজম (Neodarwinism) বা আধুনিক সংশ্লেষ মতবাদ (Modern synthesis theory) নামে অভিহিত করা হয়।

ডারউইনের মতবাদের সবচেয়ে দুর্বল দিক যেটা ছিল তা হলো বংশগতিতে জিনের ভূমিকা সম্মন্ধে তাঁর কিছুই জানা না থাকায় প্রকরণের সন্তোষজনক কারণ তিনি দেখাতে পারেননি। তিনি যে স্পষ্ট প্রকরণকে (conspicuous variation) ভিত্তি করে প্রারম্ভিক বা গঠনমুখ প্রজাতির কথা উল্লেখ করেছেন তা মূলত জিন নির্ধারক বৈশিষ্ট্য। নিওডারউইনিজমের প্রবর্তকেরা যুক্তি দেখান যে, পরিবর্তন আনয়নকারী এসব জিনের উদ্ভব হয় পরিব্যক্তির মাধ্যমে। আর ধারাবাহিক পরিব্যক্তি সংগৃহীত হবার ফলে একটি গঠনমুখ প্রজাতি বা উপ প্রজাতি এবং শেষ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জিনের গুণগত বৈশিষ্ট্য এ নতুন প্রজাতিকে হয় টিকে থাকতে নতুবা বিলুপ্তি ঘটাতে সহায়তা করে।

CamScanner

বিবর্তনের প্রমাণ (Evidence of evolution)

বিজ্ঞানীদের দেয়া বিভিন্ন মতবাদ ও তথ্যাদি থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে বিবর্তন একটি সচল প্রক্রিয়া, যা খুব ধীর গতিতে প্রকৃতিতে সব সময় ঘটে চলছে। পৃথিবীতে বিদ্যমান অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে যে আকৃতিগত, অঙ্গসংস্থানিক ও আচরণগত বৈচিত্র্য দেখা যায় তা অতি সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পরিবর্তনের ধারা বেয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। বিবর্তনের ধারণানুযায়ী পৃথিবীর সকল প্রাণীই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এবং একারণেই এরা বিভিন্ন দিক দিয়ে একে অন্যে সাথে সম্পর্কযুক্ত। কলাকৌশল নিয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীগণ বিবর্তনের স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। বিবর্তনের বহুল আলোচিত প্রমাণগুলো হলো:

১। জীবাশ্মগত ও ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Paleontology and Geology)
২। শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ (Evidence from Taxonomy)
৩। জীব ভৌগোলিক প্রমাণ (Evidence from Biogeography)
৪। অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ (Evidence from Morphology)
৫। ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Embryology)
৬। শারীরবৃত্তীয় ও জীবরসায়নঘটিত প্রমাণ (Evidence from Physiology and Biochemistry)
৭। কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Cytology)
৮। জিনতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Genetics)

নিম্নে এসব প্রমাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। জীবাশ্মগত ও ভূ-তাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Paleontology and Geology): সুদূর অতীতে বিলুপ্ত কোনো জীবের দেহ বা দেহাংশ বা কোনো চিহ্ন প্রাকৃতিক উপায়ে পাললিক শিলায় প্রস্তরীভূত হয়ে সংরক্ষিত থাকলে তাকে জীবাশ্ম বা ফসিল (fossil) বলে। জীবাশ্ম বিবর্তনের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। জীবাশ্মের অধ্যয়নের মাধ্যমে অতীতের প্রাণীকূলের অবস্থা এবং কীভাবে বিভিন্ন ধারায় পরিবর্তিত ও অভিযোজিত হয়ে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। ভূত্বকে বিদ্যমান পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তর পৃথিবীর অতীত যুগের বিভিন্ন সময়ের ভূতাত্ত্বিক অবস্থার চিহ্ন বহন করে যেগুলো থেকে ভূত্বকের বয়স ও সময় এবং প্রস্তরীভূত অতীতের প্রাণী সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তর থেকে অনেক প্রাণীর ক্রমবিকাশের চমৎকার ঐতিহাসিক ধারাবাহিক জীবাশ্ম তথ্য পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে মানুষ, হাতি, ঘোড়া, উট উল্লেখযোগ্য।

ঘোড়ার পূর্বসূরী হিসেবে এক ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট *Hyracotherium* প্রাণীটি প্রথম উত্তর আমেরিকায় আর্বিভূত হয় ইয়োসিন যুগে। এরা আকৃতিতে অনেকটা ছোট কুকুরের মতো ছিলো। বিবর্তনের পথ বেয়ে বিভিন্ন সময়ে *Miohippus, Merychippus* এবং *Pliohipppus* এর মাধ্যমে আধুনিককালের ঘোড়া *Equus* এর উদ্ভব হয়েছে যারা সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত আছে। ঘোড়ার বিবর্তনের সাথে যুগপৎ ভূতাত্ত্বিক বিরাট পরিবর্তনের একটি সাদৃশ্যপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস বিবর্তন সম্পর্কিত প্রমাণ বহন করে।

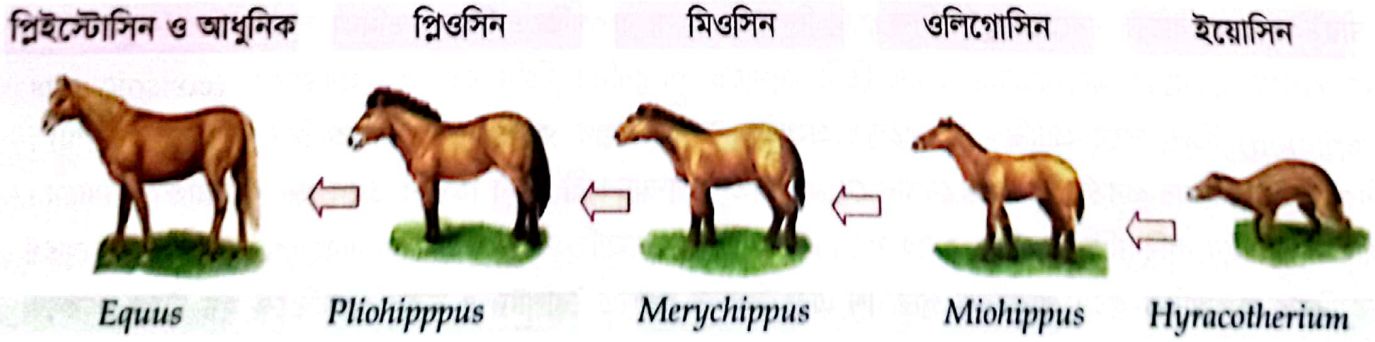

চিত্র: ১১.৭ ঘোড়ার বিবর্তনের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

CamScanner

বিবর্তন সম্পর্কিত জীবাশ্মঘটিত অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় *Archaeopteryx* নামক একটি জীবাশ্ম থেকে। *Archaeopteryx* একটি পাখির জীবাশ্ম যা আজ থেকে 140 মিলিয়ন (14 কোটি) বছর পূর্বে জুরাসিক পিরিয়ডে পৃথিবীতে বাস করত। বিজ্ঞানী আঁদ্রে ওয়াগনার (Andres Wagner) 1861 সালে জার্মানির বাভারিয়া নামক স্থান থেকে *Archaeopteryx lithographica* নামক পাখির জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। 1877 ও 1956 সালে একই স্থান থেকে এ পাখির যথাক্রমে ২য় ও ৩য় জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। এসব পাখি আকারে অনেকটা বর্তমানকালের কাকের মতো ছিলো, কিন্তু এদের ছিল ডাইনোসোরদের মতো লম্বা লেজ। জীবাশ্মের বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীদের দেয়া তথ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে *Archaeopteryx* হলো বিবর্তনিক সংযোগকারী প্রাণী যাতে সরীসৃপ ও পাখির বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে।

Archaeopteryx এ সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য

১। দেহ ও বাহুতে আঁইশের উপস্থিতি।
২। অস্থিগুলো নিরেট প্রকৃতির।
৩। শক্তিশালী চোয়ালের কোটরে বসানো সমআকৃতির দাঁত।
৪। লিজার্ডের মতো লেজ যা 20টি কশেরুকা সমৃদ্ধ।
৫। অগ্রপদে তিনটি করে নখরযুক্ত আঙ্গুলের উপস্থিতি।
৬। মস্তিষ্কের গঠন সরল, সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার নলাকৃতির।

চিত্র ১১.৮ *Archaeopteryx* এর জীবাশ্মের ছাপ

Archaeopteryx এ পাখির বৈশিষ্ট্য

১। দেহে উন্নত পালকের উপস্থিতি।
২। অগ্রপদ ডানায় রূপান্তরিত এবং এতে উড্ডয়ন পালক রেমিজেসের (remiges) উপস্থিতি।
৩। লেজে উড্ডয়ন পালক রেক্ট্রিসেসের (rectrices) উপস্থিতি।
৪। চোয়াল চঞ্চুতে রূপান্তরিত।
৫। দুটি ক্ল্যাভিকল অস্থি মিলিত হয়ে V আকৃতির ফারকুলা (furcula) গঠন।
৬। মাথার খুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং 1টি অক্সিলিপটাল কন্ডাইলযুক্ত।

চিত্র ১১.৯ *Archaeopteryx* এর কাল্পনিক প্রাণী

বিজ্ঞানীগণ মনে করেন পাখিদের উৎপত্তি ঘটে সরীসৃপ ও পাখিদের মধ্যবর্তী প্রাণী *Archaeopteryx* থেকে। নিম্নতর সরীসৃপ প্রাণী থেকে উন্নত পাখিদের বিবর্তনের ক্ষেত্রে *Archaeopteryx* একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। বিজ্ঞানী হাক্সলি (Huxley) যথার্থই বলেছেন **Birds are glorified reptiles** অর্থাৎ পাখিরা হলো মহিমান্বিত সরীসৃপ। পাখিদের বিবর্তনিক পথ হলো:

সরীসৃপ → ***Archaeopteryx*** → পাখি।

জীবন্ত জীবাশ্ম (Living fossil): সুদূর অতীতে বিলুপ্তপ্রাপ্ত প্রাণী যাদের নিদর্শন কেবল জীবাশ্মে পাওয়া যায় তাদের সাথে বর্তমানে জীবিত কোনো প্রজাতির প্রাণীর সাদৃশ্য বা মিল থাকলে উক্ত প্রজাতিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিল বলে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত স্তন্যপায়ী হংস চঞ্চু প্লাটিপাস (Duck-billed Platypus-*Ornithorhynchus*), আর্থ্রোপোডা পর্বের সামুদ্রিক প্রাণী লিমুলাস (*Limulus*), নিউজিল্যান্ডে প্রাপ্ত সরীসৃপ শ্রেণির টুয়াটারা (*Sphenodon*), অস্থিযুক্ত সামদ্রিক মাছ লাটিমেরিয়া (*Latimaria*) ইত্যাদি জীবন্ত জীবাশ্ম বিবর্তনের নানাবিধ প্রমাণ বহন করে।

CamScanner

Limulus *Latimaria* *Sphenodon* *Ornithorhynchus*

চিত্র ১১.৯ কয়েকটি জীবন্ত জীবাশ্ম প্রাণী

ভূতাত্ত্বিক কালক্রম (The geologic time scale-GTS): ভূতাত্ত্বিক কালক্রম হলো পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জিকা। নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ভূতাত্ত্বিক কালক্রম

ইরা (Eras)	পিরিয়ড (Period)	ইপোক (Epoch)	বছর পূর্বে	প্রধান প্রাণী (Dominalt animal)	মন্তব্য (Remark)
সিনোজোয়িক (Coenozoic)	কোয়াটারনারি (Quaternary)	রিসেন্ট (Recent)	25 হাজার	আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষের বিকাশ	স্তন্যপায়ীর যুগ (Age of Mammals)
		হলোসিন (Holocene)	1 লক্ষ	মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির বিকাশ, কৃষিকাজ ও পশুপালন	
		প্লিস্টোসিন Plestocene)	10 লক্ষ	প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিকাশ, লোমশ ম্যামথ স্তন্যপায়ীর বিলুপ্তি	
	নিওজিন Neogene	প্লিওসিন (Pliocene)	2 কোটি	হোমোনিড মানুষের উদ্ভব, স্তন্যপায়ীদের ব্যাপক বিকাশ	
		মায়োসিন (Miocene)	3.5 কোটি	গড়িলা, বানর, শিম্পাঞ্জি, হাতি ও ঘোড়ার প্রাধান্য	
	প্যালিওজিন (Paleogene)	ওলিগোসিন (Ologicene)	4.5 কোটি	আর্কটিক শিকারী স্তন্যপায়ীদের ব্যাপক বিকাশ	
		ইয়োসিন (Eocene)	6.5 কোটি	আদিম স্তন্যপায়ীর বিলুপ্তি, অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য	
		প্যালিওসিন (Paleocene)	7.5 কোটি	আদিম পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য	
মেসোজোয়িক (Mesozoic)	ক্রিটেসিয়ান (Cretaceous)		13.5 কোটি	ডাইনোসরদের প্রাধান্য ও বিলুপ্তি, মার্সুপিয়ালদের বিকাশ	সরীসৃপদের যুগ (Age of Reptiles)
	জুরাসিক (Jurassic)		16.5 কোটি	ডাইনোসরদের বিকাশ, প্রথম পাখি *Archaeopteryx* উদ্ভব	
	ট্রায়াসিক (Triacic)		22.5 কোটি	ডাইনোসরদের উদ্ভব, স্তন্যপায়ী সদৃশ্য সরীসৃপদের প্রাধান্য	
প্যালিওজোয়িক (Paleozoic)	পার্মিয়ান (Permian)		24 কোটি	উভচর প্রাণীর বিকাশ, পতঙ্গের প্রাধান্য	উভচরের যুগ (Age of Amphibians)
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		29 কোটি	উভচর প্রাণীর উদ্ভব, পতঙ্গ, কন্টকত্বক, হাঙ্গরের প্রাধান্য	
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		37.5 কোটি	বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রাধান্য, প্রথম উভচর	মাছের যুগ (Age of Fishes)
	সিলুরিয়ান (Silurian)		42 কোটি	কাঁকরা, বিছা, শতপদীর বিকাশ, আদি মাছের উদ্ভব	
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		50.5 কোটি	প্রবাল ও শামুকের বিকাশ, প্রথম চোয়ালবিহীন মাছ	সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডীর যুগ (Marine invertebrate)
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		58.5 কোটি	সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী, ট্রাইলোবাইট, ব্রাকিওপোড	
প্রোটেরোজোয়িক (Proterozoic)			250 কোটি	প্রোটোজোয়াদের প্রাধান্য	
আর্কিওজোয়িক (Archeozoic)			400 কোটি	জীবনে সূচনা, জীবাশ্মবিহীন	

CamScanner

২। শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ (Evidence from Taxonomy): বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রাণিজগতের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস গড়ে উঠেছে। প্রাণীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন অঙ্গসংস্থান এবং জ্ঞাতিতাত্ত্বিক সম্পর্ক যাচাই করে এসব বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয় যার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর গণ (genus), গোত্র (family), বর্গ (order), শ্রেণি (class), পর্ব (phylum) ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতিতে বৈশিষ্ট্যের তারতম্য থাকার কারণেই শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন স্তরের উৎপত্তি হয়েছে যা বিবর্তনের প্রমাণ বহন করে। বিবর্তনের ধারণা অনুযায়ী আদিকালে কেবল একটি বা কয়েকটি প্রজাতির প্রাণী ছিলো। পরে এদের ধারাবাহিক ও ধীর পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে অগণিত অন্যান্য প্রজাতি। বিবর্তনের পথ ধরে সামনের দিকে যতই অগ্রসর হয়েছে ততই নিম্নস্তরের প্রাণী হতে উচ্চস্তরের প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। তাই প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের যত নিচে যাওয়া যায় তত বেশি প্রাণীর মধ্যে মিল পাওয়া যায়।

কিছু প্রাণী পাওয়া যায় যারা ভিন্ন ভিন্ন দুটি শ্রেণির প্রাণীর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং ফলে শ্রেণিবিন্যাসের সময় তাদের কোনো শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এদের কানেকটিং লিঙ্ক (connecting link) বলে এবং এসব প্রাণীর উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই বিবর্তনের প্রমাণ বহন করে ও তার গতিপথ নির্দেশ করে। *Peripetus* প্রাণীটি Annelida ও Arthropoda পর্বের প্রাণীদের মধ্যে কানেকটিং লিঙ্ক হিসেবে গণ্য হয়।

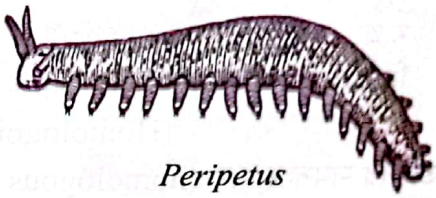

Peripetus
(the velvet worm)
(Phylum: Onychophora)

৩। জীব ভৌগোলিক প্রমাণ (Evidence from Biogeography): ডারউইন তাঁর মতবাদে জীবের ভৌগোলিক অবস্থান বা বিস্তৃতিকে বিবর্তনের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রতিটি প্রাণিগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং পরে সেখান থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাণীর বিস্তৃতিলাভের সময় পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে তাদের অনেক আঙ্গিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বিচ্ছিন্নতার ফলে বিভিন্ন পরিবেশের প্রাণী নিজস্ব ধারায় বিবর্তিত হয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করে। বিবর্তনবাধীদের মতে সমগ্র পৃথিবী একসময় গন্ডোয়ানাল্যান্ড (Gondwanaland) নামে এক অখণ্ড ভূখণ্ড হিসেবে বিরাজিত ছিলো। পরবর্তীতে দীর্ঘকালের ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে এটি বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন মহাদেশ গঠন করে। এ বিচ্ছিন্নতার ফলে পূর্বেকার সকল প্রাণী বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পরে এবং স্ব স্ব পরিবেশে অভিযোজিত হয়ে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভাবন ঘটায় এবং যেসব প্রাণী নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে পারেনি তারা ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪। অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ (Evidence from Morphology): নিকট সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গসংস্থান তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করলে তাদের গঠন পরিকল্পনায় অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। প্রাণীর অঙ্গসংস্থানের এ সম্পর্ককে বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। একটি পর্বের বিভিন্ন শ্রেণির প্রাণীতে কোনো একটি বিশেষ অঙ্গের গঠন তুলনা করলে তাদের মধ্যে স্পষ্ট মিল লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ অঙ্গটি মূল কাঠামো সকলক্ষেত্রে একইরকম। তুলনামূলক অঙ্গস্থানকে বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বিজ্ঞানীগণ সমসংস্থ, সমবৃত্তীয় এবং লুপ্তপ্রায় অঙ্গসমূহের কথা তুলে ধরেছেন।

(ক) তুলনামূলক অঙ্গস্থান (Comparative anatomy)

❑ মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড: বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড পর্যবেক্ষণ করলে ক্রম বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধারা পরিলক্ষিত হয়। মাছের দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড, উভচরের তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড, সরিসৃপের আংশিক চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড এবং পাখি ও স্তন্যপায়ীদের সম্পূর্ণ চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড সরল থেকে জটিল গঠনের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।

CamScanner

❑ মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক: মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মতো মস্তিষ্কের গঠনেও ক্রম বিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়। মাছ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক ক্রম বিকাশে আকারে বড় হতে দেখা যায় এবং এদের সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার ও সেরেবেলাম-এর গঠনে ক্রম জটিলতা পরিলক্ষিত হয়।

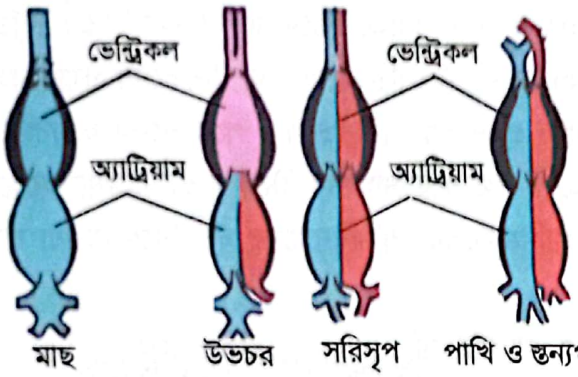

চিত্র ১১.১০ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

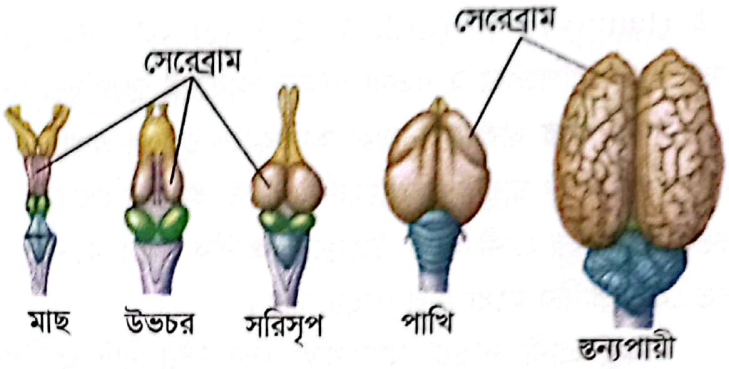

চিত্র ১১.১১ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক

(খ) সমসংস্থ অঙ্গ (Homologous organ): বিভিন্ন প্রাণীতে বিদ্যমান যেসব অঙ্গ গঠনের দিকে থেকে অনুরূপ তাদের **সমসংস্থ অঙ্গ** (homologous organ) বলে। এসব অঙ্গ কাজের দিক থেকে অনুরূপ হতে পারে বা নাও হতে পারে। পাখি ও বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত, ঘোড়ার সামনের পা এবং তিমির ফ্লিপার (দাঁড়ের মতো হাত) প্রভৃতি সমসংস্থ অঙ্গ। জীবন পদ্ধতি ও ব্যবহারের ভিন্নতার প্রয়োজনে এরা আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে।

(গ) সমবৃত্তীয় অঙ্গ (Analogous organ): বিভিন্ন প্রাণীতে বিদ্যমান যেসব অঙ্গ কাজের দিক থেকে অনুরূপ কিন্তু গঠন ও উৎপত্তির দিকে থেকে ভিন্নতর হয় তাদের **সমবৃত্তীয় অঙ্গ** (analogous organ) বলে। যেমন- পাখির ডানা ও প্রজাপতির ডানা সমবৃত্তীয় অঙ্গ। উভয়েই প্রাণীকে উড়তে সাহায্য করে কিন্তু এদের গঠন ও উৎপত্তিতে কোনো মিল নেই।

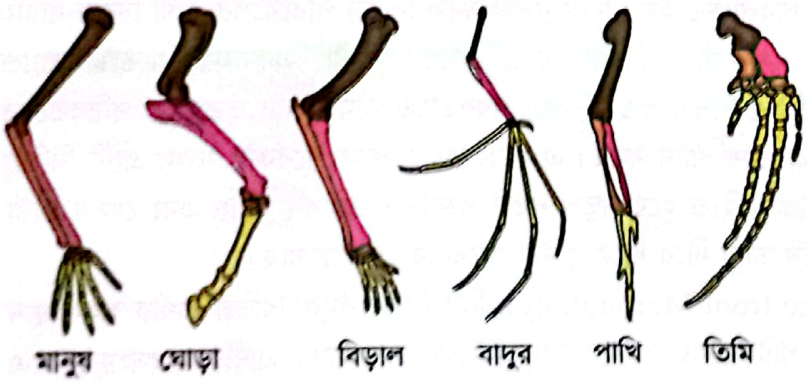

চিত্র:১১.১২ প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের অগ্রপদ (সমসংস্থ অঙ্গ)

চিত্র:১১.১৩ প্রাণীর বিভিন্ন ধরনের ডানা (সমবৃত্তীয় অঙ্গ)

বিবর্তনবাদীরা মনে করেন সমসংস্থ অঙ্গসমূহ নিশ্চিতভাবে প্রাণীর মধ্যে প্রকৃত জ্ঞাতিতাত্ত্বিক সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে অর্থাৎ এদের বাহকেরা একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। অন্যদিকে সমবৃত্তীয় অঙ্গের উদ্ভাবন সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, বিসদৃশ্য অঙ্গ অনুরূপ কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে এদের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে এদের বাহকের জ্ঞাতিতাত্ত্বিক কোনো সম্পর্ক নেই।

(গ) লুপ্তপ্রায় অঙ্গ (Vestigial organs): প্রাণিদেহে এমন কিছু অঙ্গ আছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয় বা কার্যক্ষম নয় বলে মনে হয়। এ সব অঙ্গকে **লুপ্তপ্রায় অঙ্গ** বলে। এসব অঙ্গ বিবর্তন সম্পর্কিত প্রমাণ বহন করে। বিজ্ঞানীদের মতে এসব অঙ্গ এক সময় বহনকারী প্রাণীর পূর্বপুরুষের দেহে নিশ্চিতরূপে অপরিহার্য ও কার্যকরি ছিলো। উদাহরণ হিসেবে মানুষের অ্যাপেনডিক্স (appendix) এর নাম উল্লেখ করা যায়। অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এ অঙ্গটি

সুগঠিত ও কার্যকরি এবং সিকাম (caecum) নামে পরিচিত। বিবর্তনবাদীদের মতে মানুষ, বানর, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি উঁচু জাতের প্রাইমেটে খ্যাদ্যাভাস পরিবর্তন হওয়ায় সিকামের ব্যবহার হ্রাস পায় ও কার্যকারিতা ধীরে ধীরে লোপ পায়। ফলে এর আকার পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে লুপ্তপ্রায় অঙ্গ হিসেবে বিদ্যমান আছে। মানবদেহে প্রায় 100টি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ আছে। কানের পেশি, পিনিয়াল গ্রন্থি, কক্কিক্স, দেহের লোম, থাইমাস গ্রন্থি, টনসিল, চোখের তৃতীয় পল্লব (Plica semilunaris), সূঁচালো কর্তন দাঁত, পুরুষের স্তন, উদরের খণ্ডকীয় পেশি ইত্যাদি মানুষের লুপ্তপ্রায় অঙ্গ। অন্যান্য অনেক প্রাণীতে লুপ্তপ্রায় অঙ্গ দেখা যায়। গর্তে ও গুহায় বসবাসকারী অনেক উভচর, সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গ আছে যাদের চোখ ক্ষয়প্রাপ্ত বা অনুপস্থিত, অথচ এসব প্রাণীর জ্ঞাতিদের মধ্যে যারা উন্মুক্ত জায়গায় বাস করে তাদের চোখ সুগঠিত।

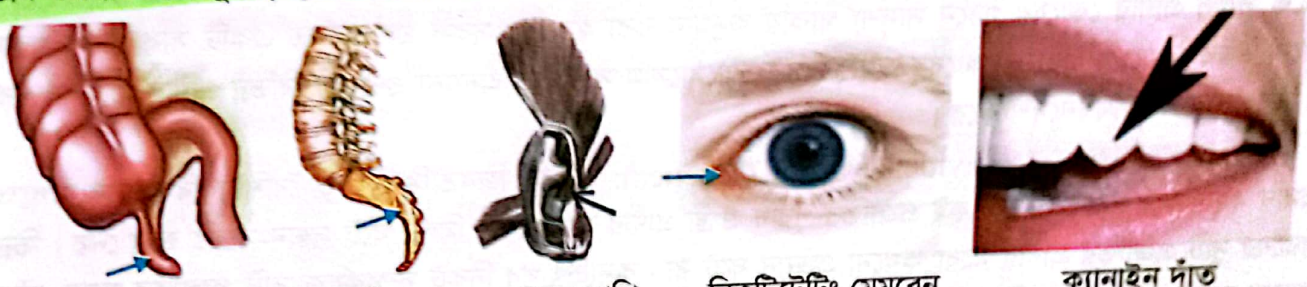

চিত্র ১১.১৪ মানুষের বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় অঙ্গ

৫। ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Embryology): সকল বহুকোষী প্রাণীর জীবনচক্রের প্রাথমিক দশায় ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন দেখা যায়। প্রাণীর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের দশাগুলোর অধিকাংশক্ষেত্রেই পরিণত প্রাণীর অনুরূপ নয় বরং অনেকক্ষেত্রে নিম্নতর প্রজাতির বয়স্ক প্রাণীর অনুরূপ। তবে বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়গুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আর এ সাদৃশ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রাণিবিদ আর্নেস্ট হেকেল (Earnst Haekel) তাঁর বিখ্যাত 'পুনরাবৃত্তি মতবাদ' বা Recapitulation theory বা Biogenic Law ব্যক্ত করেন। এ মতবাদ অনুযায়ী 'ব্যক্তিজনি জাতিজনির পুনরাবৃত্তি ঘটায়' অর্থাৎ Ontogeny recapitulates (repeat) Phylogeny (Ontogeny=জীবের জীবনচক্র; Phylogeny= জীবের বিবর্তন ইতিহাস)। হেকেলের ধারণা ছিলো যে, ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায় পূর্বপুরুষের পরিণতদের অনুরূপ। বর্তমানে এ ধারণার কিছুটা পরিবর্তন করে বলা হয়, ভ্রূণের বিভিন্ন দশা আসলে পূর্বপুরুষদের ভ্রূণের অথবা অপরিণত বয়স্কদের চেহারার প্রতিফলন ঘটায়।

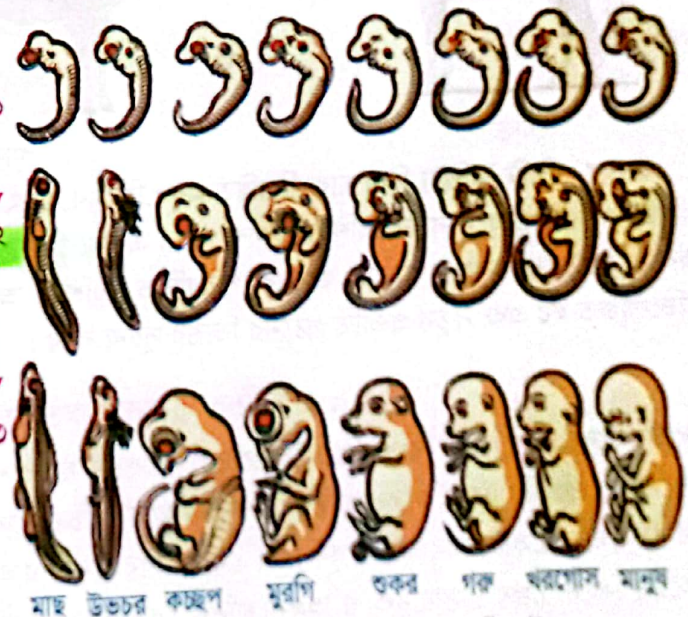

চিত্র ১১.১৫ মেরুদণ্ডীদের ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের বিভিন্ন দশায় অদ্ভুত ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এ থেকে স্পষ্ট ধারণা করা হয় যে মাছের ন্যায় কোনো এক পূর্বপুরুষ হতে বিবর্তনের মাধ্যমে উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

৬। শারীরবৃত্তীয় ও জীবরসায়নঘটিত প্রমাণ (Evidence from Physiology and Biochemistry): জীবের শারীরবৃত্তীয় এবং জীবরাসায়নিক কতগুলো দিক বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে বিবেচণা করা হয়। প্রায় সকল প্রাণীর

পরিপাক, রেচন এবং স্নায়ু সংবহনের শারীবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো মোটামুটি একইরকম। ধারণা করা হয় বিভিন্ন প্রাণী বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হওয়ার পূর্বেই এ অঙ্গগুলো তাদের মধ্যে উদ্ভব হয়েছিল। রক্তের হিমোগ্লোবিন, রক্ত আমিষ, এনজাইম ও হরমোনের জীব রাসায়নিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রাণিগোষ্ঠীতে এসব উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্যতা লক্ষ করা যায় যা বিবর্তনের সপক্ষে সন্দেহাতীভাবে প্রমাণ নির্দেশ করে।

৭। কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Cytology): সকল প্রাণীর দেহই কোষীয় একক দ্বারা গঠিত। প্রাণীর শ্রেণিতাত্ত্বিক বা আকৃতিগত যতই বৈসাদৃশ্য থাকুক না কেন সকলের কোষীয় গঠন প্রায় একরকম। জৈব রাসায়নিক দিক থেকে সকল প্রাণীর কোষের গঠনে সাদৃশ্য থাকায় অনুমান করা হয় যে, সকল প্রাণী মূলত একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভব হয়েছে। এছাড়া কোষের অঙ্গসংস্থান, ক্রোমোসোম সংখ্যা ও অন্যান্য গুণাবলী বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক ও বিবর্তনের গতিপথ নির্দেশ করে।

৮। জিনতাত্ত্বিক প্রমাণ (Evidence from Genetics): জীবের জিনতাত্ত্বিক কিছু বৈশিষ্ট্য বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। প্রকৃতিতে একই প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীর মধ্যে যৌন মিলন ঘটে সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। ভিন্ন ধরনের দুটি প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে কখনো প্রজনন ঘটে না। কদাচিৎ খুব নিকট সম্পর্কযুক্ত দুটি প্রজাতির মধ্যে যৌন জননে সংকর ও বন্ধ্যা প্রাণীর সৃষ্টি হয়। যেমন- গাধা ও ঘোড়ার যৌন মিলনে খচ্চর নামক বন্ধ্যা সংকর প্রাণীর সৃষ্টি হয়। এ সংকর সন্তান উৎপাদন অবশ্যই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে।

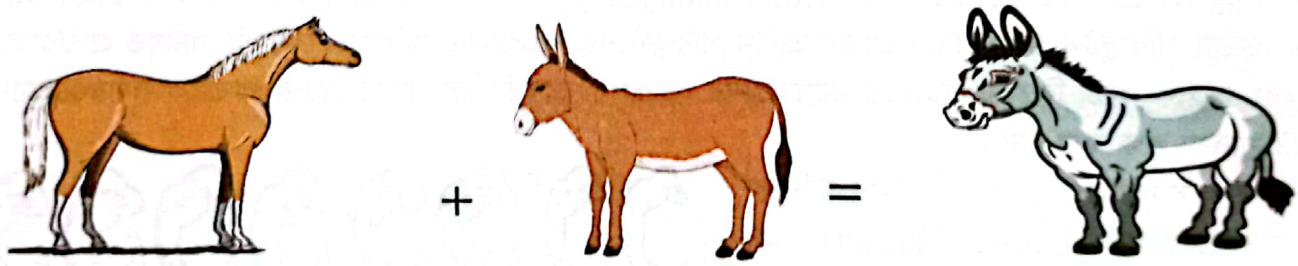

ঘোড়া + গাধা = খচ্চর

জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জিনের হঠাৎ কোনো পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটলে প্রজাতির মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। এজন্য মিউটেশনকে বিবর্তনের কাঁচামাল হিসেবে গণ্য করা হয়। জিন মিউটেশনের ফলে আনীত জীবের পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য অনেকসময় প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবেশে অভিযোজিত হয় এবং নতুন প্রজাতি গঠনের ভিত্তির সূচনা করে।

১১.৯ প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান

বিবর্তন হলো জীবগোষ্ঠীর বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন যা বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। বিবর্তনের ফলে জীবের জীবগোষ্ঠী, প্রজাতি এমনকি বংশগতিয় উপাদানসমূহে বৈচিত্র্য দেখা যায়। পৃথিবীর সকল জীবই 3.8 বিলিয়ন বছর পূর্বে বিদ্যমান একটি সার্বজনীন পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। DNA সিকুয়েন্স কিংবা জৈব রাসায়নিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থেকে জীবের প্রজাতিকরণ ও বৈচিত্র্যতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত প্রজাতিসমূহের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় যা জীবিত এবং বিলুপ্ত প্রজাতির বিবর্তনিক ইতিহাস নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘকালব্যাপি জীবের ধারাবাহিক প্রজাতিকরণ ও বিলুপ্তি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

চার্লস ডারউইন সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি তুলে ধরেন। জীব প্রজাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়া হয়:

(১) বাঁচার সম্ভাবনার চেয়ে অধিক সংখ্যক সন্তান উৎপাদন;

CamScanner

(২) প্রজাতির মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিছু প্রকরণ দেখা যায় যেগুলো তাদের বেঁচে থাকতে এবং প্রজননের জন্য সহায়ক এবং

(৩) এসব বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়।

সুতরাং জীবগোষ্ঠীর কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরপুরুষ দ্বারা প্রাকৃতির পরিবেশের সে স্থান প্রতিস্থাপিত হয় যেখানে তারা আরো ভালো অবস্থায় বেঁচে থাকতে ও প্রজনন করতে পারে। পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য জীবের মধ্যে সর্বদা নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় এবং সংরক্ষিত হয়। এসব বৈশিষ্ট্যের প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা জীবের মধ্যে বিবর্তন ঘটিয়ে প্রজাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

ল্যামার্কের 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম' মতবাদ এবং ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' মতবাদ জীবের বিবর্তন সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে। এদুটি মতবাদের সারসংক্ষেপ থেকে প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

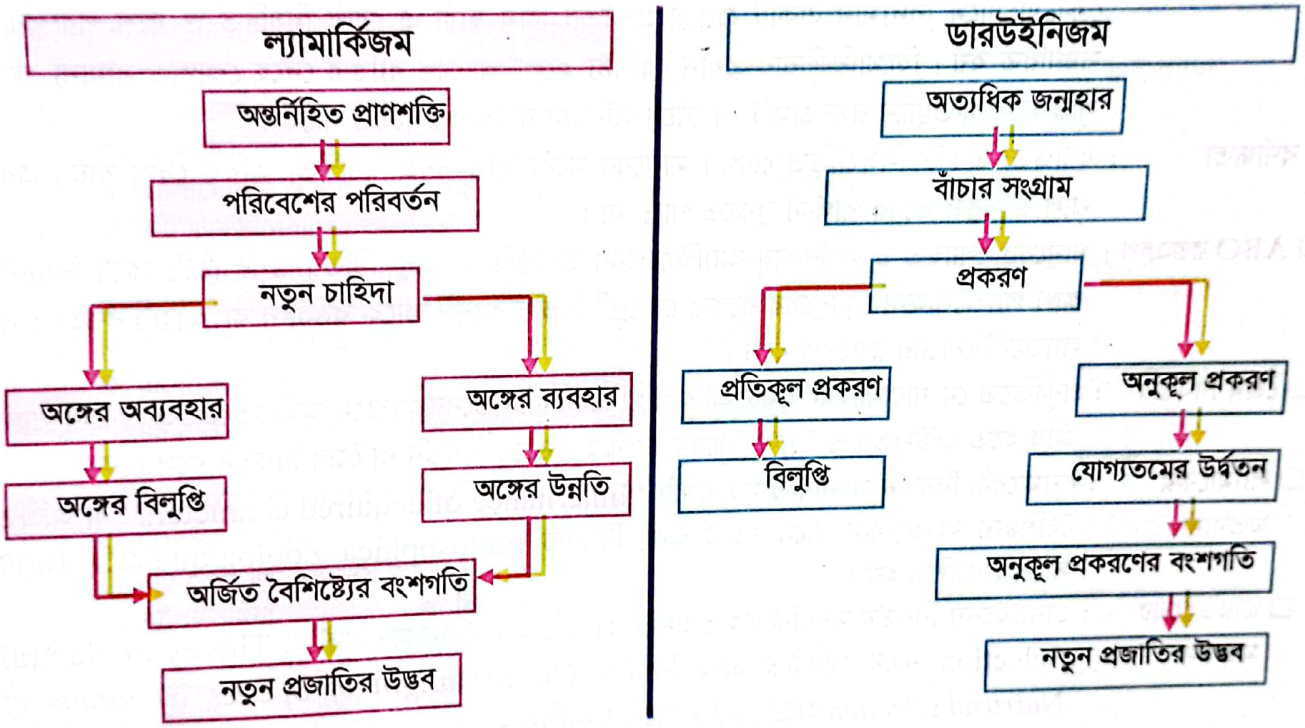

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

- **বংশগতি** : জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহ প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিতামাতা থেকে বংশাণুক্রমে সন্তান সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বংশগতি বা হেরিডিটি বলে।
- **জিনতত্ত্ব** : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের বংশগতি ও প্রকরণের রীতিনীতি অর্থাৎ বংশাণুক্রমিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি এবং এসব বৈশিষ্ট্যের বাহক জেনেটিক বস্তু তথা জিনের রাসায়নিক গঠন, প্রকরণ, মিউটেশন, পারস্পরিক ক্রিয়া, জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয় তাকে জিনতত্ত্ব বা **Genetics** বা কৌলিতত্ত্ব বলে।
- **মেন্ডেলিজম** : মেন্ডেলের সূত্র বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বংশগতিতে সঞ্চারণের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় তাকে 'মেন্ডেল তত্ত্ব বা মেন্ডেলিজম' বলে।
- **লিঙ্গ নির্ধারণ** : যে জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় জীবের লিঙ্গ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ নির্ধারিত হয় তাকে লিঙ্গ নির্ধারণ বলে।

CamScanner